সঙ্গীত সম্বন্ধ

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা—১

প্রকাশকাল :
১লা বৈশাখ ১৩৬৬
এপ্রিল-১৯৫৯

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫/২এ কলেজ রো
কলকাতা—৯

মুদ্রক :
যুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা—৬

যাঁর পদপ্রান্তে বসে আমার সঙ্গীত শিক্ষাজীবনের
স্বচনা, সেই পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর
রায়চৌধুরীর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ভূমিকা

পরিশীলিত সঙ্গীত ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা কিছুকাল আগে পর্যন্তও আবদ্ধ ছিল মধ্যযুগীয় দরবারী মহলে এবং সেই মহলেরই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বংশধর জমিদারবাবুদের বৈঠকখানায় আর বিভিন্ন ঘরানার গুরু বা ওস্তাদদের স্বল্প-পরিসর ঘরে, বারান্দায় বা চত্বরে। এ-দু'টি ব্যাপারকে, অন্যত্র না হোক; অন্তত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে, সেই প্রথাবদ্ধ সংকীর্ণ মহল থেকে উদ্ধার করে সমাজের আরও একটু বিস্তৃত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তদানীন্তন প্রসারমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে মুক্ত করে দেওয়া,—এ কাজটি করেছেন একক একটি ব্যক্তি, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মার্গসঙ্গীত, দেশী বা লোকায়ত সঙ্গীত তথা রাগসঙ্গীত, প্রবন্ধ বা কথাসঙ্গীত নিয়ে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনার মাধ্যমে তিনি যে কি বিপুল বিপ্লব ঘটিয়েছেন বাঙালীর সাংস্কৃতিক ও সাঙ্গীতিক জীবনে, এবং তা একক এক জীবনে, আমরা অনেকেই বোধহয় সে-সম্বন্ধে খুব সচেতন নই। ভারতীয় সঙ্গীত পরম্পরায় তিনিই বোধহয় আদি গুরু, যিনি আমাদের শেখালেন যে আমাদের সাঙ্গীতিক অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে মার্গ ও লোকসঙ্গীতের পার্থক্যটা সামাজিক কারণগত, সঙ্গীতের স্বধর্মগত নয়। মার্গসঙ্গীতকে তার চিরাচরিত প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত করে কী মুক্তি যে তিনি তার ঘটিয়েছেন, ভাবী সম্ভাবনার কত বড় দিগন্ত যে তিনি উন্মুক্ত করে গেছেন, আমার আশা ও বিশ্বাস, ভাবীকালের সমাজ একদিন তাঁর এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারবে। আপাতত এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, রবীন্দ্রনাথ—অতুলপ্রসাদ—দিলীপকুমার - ধূর্জটিপ্রসাদ এঁদের মধ্যে এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে যে সব আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, সাম্প্রতিক কালের বাংলা ভাষাভাষী প্রান্তে সঙ্গীত সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় এ-ই হচ্ছে প্রথম অর্থবহ আলোচনা। তখন থেকেই শুরু হয়েছে, সঙ্গীতের সামাজিকীকরণ, সঙ্গীত সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে আলোচনা, পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে সাঙ্গীতিক বিবরণ ও মন্তব্য প্রচার, সঙ্গীতের বিস্তার সাধারণ্যের সম্মেলনে। সঙ্গীতের এই মুক্তি একটি বৃহৎ সামাজিক মুক্তি। এ মুক্তি অন্যার্থে, বৃহৎ সাংস্কৃতিক মুক্তিও বটে। এই মুক্তিরই ফলশ্রুতি রূপে অন্যান্য অনেক সঙ্গীত-

লোচনা-গ্রন্থের মত দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার মশায়ের এই গ্রন্থটিকেও গণ্য করা যেতে পারে।

কিন্তু গ্রন্থটি ভারতীয় সঙ্গীতের বা বাংলাগানের কোন বিশেষ দিক বা পর্ব নিয়ে অথবা কোন একটি বা একাধিক প্রশ্ন নিয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়। এটি একটি সংকলন গ্রন্থ। রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলাগান নিয়ে গ্রন্থকার নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় নানা সময়ে নানা আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন, তেমন চোদ্দটি আলোচনা-নিবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা গান সম্বন্ধে অনুরাগী এমন সাধারণ পাঠকদের কাছে বইখানা ভাল লাগবে বলে আমার ধারণা।

দেবজ্যোতিবাবু ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র। কিন্তু কৈশোরাবস্থা থেকেই তাঁর স্বাভাবিক ও মানসিক প্রবণতা সঙ্গীতের দিকে। মার্গসঙ্গীতে তাঁর হাতে-খড়ি ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাছে, পরে তালিম নিয়েছেন পর পর নগেন্দ্রনাথ দত্ত, বসীর খাঁ এবং ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। সঙ্গীতের উপপত্তিক দিকের শিক্ষালাভ ঘটেছে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর হাতে, আর রবীন্দ্র সঙ্গীতের শিক্ষা অনাদিকুমার দস্তিদার ও সোদরাগ্রজ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে। এরই ফাঁকে একসময় দেবজ্যোতিবাবু প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি থেকে 'সঙ্গীত-প্রভাকর' উপাধিও লাভ করেন। বর্তমানে তিনি 'সুরঙ্গমা' ও 'জয়জয়ন্তী' এই দু'টি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে মার্গসঙ্গীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং নানা পত্র-পত্রিকার সঙ্গীত সমালোচক। সঙ্গীত অধ্যাপনায় তিনি ইতিমধ্যেই কিছু খ্যাতি অর্জন করেছেন।

গ্রন্থটিতে সংকলিত রচনাগুলো পড়ে মনে হয়, দেবজ্যোতিবাবু তাঁর বক্তব্য সহজ ভাবে সরল ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। বাংলাগান সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কিছু আছে। দেবজ্যোতিবাবু সাহিত্যের ছাত্র, বাংলাগানের সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা এই গ্রন্থে থাকলে ব্যক্তিগতভাবে আমি একটু খুশি হতাম। এটা আক্ষেপের কথা যে, আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা এ বিষয়ে খুব অবহিত নন। অথচ এই একটি ক্ষেত্রে বাংলাগানের এমন একটি মর্যাদা আছে যা ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে নেই, একমাত্র ভজনাঙ্গ গান ছাড়া।

নয়াদিল্লী॥ **নীহাররঞ্জন রায়**

লেখকের বক্তব্য

সঙ্গীত চর্চা ও সঙ্গীত শিক্ষাদান করার সময়ে এবং নানা সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনে সময় সময় মনে যে সব প্রশ্ন বা সমস্যার কথা মনে জেগেছে, সেগুলো বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায়, যথা : যুগান্তর, অমৃত, সুরছন্দা, ইত্তেফাক (বাংলা দেশ), সুরঙ্গমা ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় সঙ্গীতপ্রেমী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম। সেগুলোকেই একত্রে সংকলিত করে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল। বলা বাহুল্য, পুস্তকে প্রকাশিত হবার সময় প্রবন্ধগুলোকে প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনা করতে হয়েছে।

এই লেখাগুলোতে বাংলা গান ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে ও লেখাগুলো সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও সঙ্গীত প্রেমিক সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যেই বিশেষ ভাবে লিখিত।

পত্র-পত্রিকার সীমিত পরিসরের মধ্যে প্রবন্ধগুলো লিখতে হয়েছে বলে কোন বিষয়েই পূর্ণাঙ্গ বা দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। যদিও প্রত্যেকটি বিষয়ই আরো বিস্তৃত ভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার আমার পরিকল্পনা রয়েছে—সেটা সম্ভব হলে তাতে বাংলা গানের সাহিত্য-মূল্য সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত আলোচনার চেষ্টা করা হবে।

এই পুস্তকের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে আমাকে বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত করেছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু এই পুস্তকের নামকরণ করে

আমাকে উৎসাহিত করেছেন। বলাই বাহুল্য, এঁদের সম্মিলিত অবদানে এই পুস্তকের মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ জন্যে এঁদের দুজনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে আমাকে সর্বতো-ভাবে সাহায্য করেছে আমার কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অনুত্তমা (ঝুমা)। তাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

এই পুস্তক প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব ভার বহন করেছে মৌসুমী প্রকাশনী। এ জন্যে এই সংস্থার সত্ত্বাধিকারী শ্রীদেবকুমার বসুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসাধনা

আজকাল যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন বা যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতা-নুরাগী, তাঁদের কারো কারো মুখে মাঝে মাঝে একটা কথা শুনতে পাওয়া যায় যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসাধনার বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই, স্বরসাধনাটা হচ্ছে নিছক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাপার; বরঞ্চ নিয়মিত স্বরসাধনার ফলে স্বাভাবিক কণ্ঠমাধুর্যের অবনতি ঘটতে পারে, যা সুষ্ঠু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের পক্ষে অন্তরায়।

উপরের যুক্তিগুলি খুব গভীর ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে এর মূলে রয়েছে প্রধানতঃ স্বরসাধনা সম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা এবং তথাকথিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞগণের রুক্ষ কণ্ঠে লালিত্যহীন সঙ্গীত পরিবেশন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা বোধহয় অবান্তর হবে না যে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুরূপ স্বরসাধনা বা ভয়েস্ কালচারের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থাই নেই। আমরা অনেক সময়েই গান শিখি বা গান করি কোনো প্রকার কণ্ঠসাধনা না করেই। এমন কি যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করেন তাঁরাও জানেন যে ওস্তাদের নিকট গেলে তাঁরা সাধারণতঃ শুধু গান শিখিয়েই তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন; বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কণ্ঠসাধনা সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেন না। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খুশিমত কণ্ঠসাধনা করেন এবং বহু ক্ষেত্রেই ভুল পথে চলে নিজেদের স্বাভাবিক কণ্ঠলাবণ্য খুইয়ে বসেন। মুষ্টিমেয় মধুর কণ্ঠ কয়েকজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞকে বাদ দিলে দেখা যাবে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে তাঁদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এঁদের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনেই জনসাধারণ গানের আসর থেকে সসন্ত্রাস পলায়নপর

হন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনার সঙ্গে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এর সম্বন্ধে সাধারণ লোক অথবা সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান যাঁদের সীমাবদ্ধ তাঁদের ভীতির কারণ এইখানেই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসাধনা সম্বন্ধে কোনো কিছু বলতে গেলেই যে কথার উল্লেখ সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এর পরিমিতি সম্বন্ধে। ধ্রুপদে অথবা খেয়ালে কুশলী শিল্পী হতে গেলে যে পরিমাণে ও যে ভাবে কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনার প্রয়োজন হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ততখানি অথবা ঠিক সেইভাবে প্রয়োজন হয় না বলেই আমার ধারণা। দম বাড়ানো, খাদ ও অন্যান্য পর্দায় এক দমে দাঁড়িয়ে থেকে স্বরে গলাকে কায়েম করে নেওয়া, এক দমে আরোহন, অবরোহন অভ্যাসের দ্বারা গলার সাবলীলতা আনয়ন, মীড়, ছোট ছোট ছুট ও গোটা তান—এইগুলি বিশেষ ভাবে অনুশীলন করলেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুফল পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। খেয়ালের দ্রুত তান কর্তব, সুরের বলিষ্ঠ প্রয়োগ এবং ধ্রুপদী গমকের ভারী কাজ রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের না করলেও চলতে পারে। ধ্রুপদ ও খেয়ালের কতকগুলি বিশেষ কাজ বাদ দিয়ে এই ভাবে যদি পরিমিত ভাবে স্বরসাধনা করা যায় তবে কণ্ঠে কমনীয়তা হ্রাসের অথবা কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা আসার কোনো আশঙ্কা থাকে না।

তাছাড়া এটা সব সময় মনে রাখতে হবে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করবার সময় গলায় যতখানি 'ওজন' দেওয়ার প্রয়োজন হয়, রবীন্দ্র-সঙ্গীত করবার সময় গলায় ততখানি 'ওজন' দেবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, যাঁরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া অন্য সঙ্গীতেরও অনুশীলন করে থাকেন তাঁরা অনেক সময়েই স্বরসাধনার এই পরিমিতি রক্ষা করতে পারেন না। ফলে তাঁদের স্বরসাধনার সঙ্গে খেয়ালী বা ধ্রুপদী স্বরসাধনার কোনো পার্থক্য থাকে না। এতে অনেক সময় শ্রমের অপব্যয় হয় এবং কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের স্বরসাধনা সম্বন্ধে ভীতি বা সতর্কতার সঙ্গত কারণ আছে। এই জন্যই বোধহয় অনেকে স্বরসাধনা সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে থাকেন। অবশ্য যাঁরা অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী তাঁদের বেলায় উপরোক্ত নিয়ম (হয়তো কোনো নিয়মই) খাটে না। তাঁরা কণ্ঠ অক্ষুণ্ণ রেখে সব রকম সঙ্গীতই সমান দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করতে পারেন। সতর্কতা তাঁদের ব্যাপারেই প্রয়োজন যাঁদের সাঙ্গীতিক মান সাধারণ বা নিম্নস্তরের।

স্বরসাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা যদি বিশ্লেষণ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীতে, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিমিত স্বরসাধনা প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যক। স্বর সাধনার প্রধান ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য শ্বাস ও প্রশ্বাসকে আয়ত্তে এনে গলার স্বরস্থান ঠিক করা এবং সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরগুলিকে চেনা। প্রথমে ধরা যাক স্বরসংস্থান করা। এটা যাঁদের ঠিক নেই তাঁরা যে কোন গানই করুন না কেন তা বেসুরো হবে এবং তা কখনো সঙ্গীত পদ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ স্বরবোধ। অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত ভক্তকে বলতে শুনেছি যে গুরুদেবের গান বনের পাখির মত অবলীলাক্রমে গেয়ে যাওয়ার জিনিস, এতে কি পর্দা লাগল, কি তাল ব্যবহৃত হল, এই সব টেকনিক্যাল প্রশ্ন এনে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করা উচিত নয়।

ভাবাবেগে উচ্চারিত এই সব অবাস্তব মতবাদকে প্রশ্রয় দিলে এগুলো যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্ভুল প্রচারে এবং তার সম্যক মহত্ত্ব উপলব্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, একটু ধীর ভাবে চিন্তা করলেই তা বোধগম্য হবে।

প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেন, তাঁদের শুধু গান গাইলেই চলবে না, অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের দায়িত্বও তাঁদের নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে তাঁরা যে রবীন্দ্রসঙ্গীতখানি শেখাবেন, তাতে ব্যবহৃত স্বরগুলি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা যদি তাঁদের

না থাকে তবে কি ভাবে তাঁরা তাদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন? রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা স্বরলিপির মাধ্যমেই করা হয়েছে, সুতরাং স্বরলিপি থেকে যাঁরা গান শিখবেন বা শেখাবেন তাঁদের নির্ভুল স্বরজ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে যদি আমরা ভালো ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি তবে দেখা যাবে যে এতে মীড, অর্থাৎ এক স্বর থেকে অন্য স্বরে অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে গড়িয়ে যাওয়া, টপ্পার সূক্ষ্ম কাজ এবং হালকা ও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তানের প্রাধান্য রয়েছে। এই সমস্ত অলঙ্করণ কোনো অমার্জিত কণ্ঠে কখনই ফোটানো সম্ভব নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদাঙ্গ ও খেয়ালাঙ্গ গানের সংখ্যাও কম নয়। এগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হলে মার্জিত কণ্ঠ প্রয়োজন, যা নিয়মিত স্বরসাধনা ছাড়া কোনো মতেই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

আজকাল কলকাতা শহরে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের বহু প্রতিষ্ঠান হয়েছে এবং হাজার হাজার শিক্ষার্থী সেগুলিতে শিক্ষালাভ করছেন কিন্তু ঐগুলি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক'জন ভালো শিল্পী তৈরী হয়েছেন বা হচ্ছেন—এই প্রশ্নটা এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে যে কলকাতার অন্যতম বৃহৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে এই বিষয়ে আত্মসমালোচনা ও আক্ষেপ করতে দেখেছি।

স্কুলে বহু ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে শেখানোর গলদ, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের অভাব—এ সব কথা ছেড়ে দিলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাঙ্গীতিক মানের অবনতি এবং ভালো শিল্পী তৈরি না হওয়ার মূলে অন্যতম কারণ স্বরূপ রয়েছে স্বরসাধনার প্রতি অবহেলা। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ একজন গায়ককেও এই মত সমর্থন করতে শুনেছি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আগে শিখতে যেতেন তাঁরাই, যাঁদের সঙ্গীতে খুব একটা নৈপুণ্যের লক্ষণ দেখা যেতো কিন্তু বর্তমানে হাওয়া বদলাচ্ছে। এখন অনেকের কাছে, বিশেষ

করে মেয়েদের কাছে সঙ্গীত একটা অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে যাঁরা গান শিখতে আসেন তাঁদের অধিকাংশই খুব সুকণ্ঠ বা সঙ্গীতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বলেই যে তাঁরা গান শিখতে আসেন তা নয়। তাঁরা আসেন কারণ তাঁদের বা তাঁদের অভিভাবকগণের ধারণা লেখাপড়ার মত গান শেখাটাও একটা অবশ্য করণীয় বিষয়। সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারিনী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। যাঁরা সঙ্গীত শিক্ষায়তনে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের ভার নিয়ে থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের এমন সব ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাদান করতে হয় যাঁদের সাঙ্গীতিক যোগ্যতা ও কণ্ঠসম্পদ মধ্য বা নিম্নস্তরের। এই রকম ছাত্রছাত্রীদের মোটামুটি ভাবে সঙ্গীতের উপযোগী করে তোলার জন্য পরিমিত স্বরসাধনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। কৈশোরে এবং যৌবনে দেহের একটা স্বাভাবিক লাবণ্য ও সৌন্দর্য থাকে যা যৌবনান্তে ম্লান হয়ে আসে। যাঁরা দীর্ঘকাল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তাঁরা দেহের নানা প্রকার যত্ন নিয়ে থাকেন। ব্যায়াম, যৌগিক আসন – এই সব প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে সমর্থ হন। কণ্ঠলাবণ্য ও কণ্ঠযৌবন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

নিয়মিত কণ্ঠ অনুশীলন না করলে অল্প বয়সের বা যৌবনের স্বাভাবিক কণ্ঠমাধুর্য অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হয়। ত্রিশ বৎসর বয়সের পর থেকেই কণ্ঠের অবনতি ঘটতে থাকে। যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী কণ্ঠানুশীলন বা স্বরসাধনা ছাড়াই শুধুমাত্র স্বাভাবিক কণ্ঠ-লাবণ্যকে মূলধন করে সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেন তাঁদের শিল্পী-জীবন অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী হয়। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের পরে সাধারণতঃ তাঁদের আর শিল্পী হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নিয়মিত কণ্ঠসাধনার ফলে ষাট-সত্তর বছর বয়সেও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞদের স্বর-

মাধুর্য এবং সঙ্গীত পরিবেশন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকতে দেখা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীজীবনকে দীর্ঘায়ু করতে হলে নিয়মিত এবং পরিমিত স্বরসাধনার নিতান্ত প্রয়োজন।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনেই স্বরসাধনাকে শিক্ষণীয় বিষয় করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে যদিও এটাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তবুও বহুক্ষেত্রেই একে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শেখানোর পদ্ধতিকে প্রায়ই অত্যন্ত মামুলী ও ও নীরস করে রাখা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এতে কোনো আনন্দ পান না। স্বরসাধনার ক্লাসকে এড়িয়ে চলবার একটা প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। তাছাড়া যাঁরা এই সব শিক্ষায়তনে স্বরসাধনার ভার নিয়ে থাকেন তাঁদের বেশীর ভাগই শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা বা আগ্রহ থাকে না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবও পোষণ করেন না। সুতরাং এঁরা যখন স্বরসাধনা অভ্যাস করান তখন তা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মামুলী রাস্তা ধরেই চলে। কি ভাবে স্বরসাধনা করলে তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহায়ক হতে পারে, সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীরা তাঁদের কাছে বিশেষ কোনো সাহায্য পান না। ফলে তাঁদের নির্দেশিত স্বরসাধনা, স্বর প্রয়োগের পদ্ধতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী দুই সমান্তরাল সরল রেখার মত এগিয়ে চলে, কোথাও এক সঙ্গে মেলবার সুযোগ পায় না।

যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনে স্বরসাধনার ভার নেবেন, তাঁদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ যে তাঁরা যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালো করে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করেন। তা না হলে তাঁদের অনুসৃত স্বরসাধনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সহায়ক না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এ আশঙ্কা করাও বোধহয় অন্যায় হবে না যে, তাঁদের নির্দেশিত স্বরসাধনার পথে চলে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের মূল হিন্দী ভাষা, খেয়াল ও ধ্রুপদের গানগুলো অনেক ক্ষেত্রে হয়তো

হিন্দুস্থানীই থেকে যাবে, পুরোপুরি বাঙালী হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে না।

সুতরাং উপসংহারে এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরসাধনার প্রয়োজন নিশ্চই রয়েছে, তবে তা করতে হবে পরিমিত ভাবে ও সতকর্তার সঙ্গে, যাতে গলায় রুক্ষতা না আসে ও হিন্দুস্থানী গানের কতগুলো 'ম্যানারিজম' গলায় স্থায়ী ভাবে বাসা না বাঁধে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ রাগিণী

ববীন্দ্রসঙ্গীতকে পর্যালোচনা কবলে দেখতে পাওয়া যাবে যে তাতে মুখ্যতঃ তিনপ্রকাব সঙ্গীতেব ধারা এসে মিশেছে। সেগুলি হল যথাক্রমে উচ্চাঙ্গ হিন্দী সঙ্গীত, বাংলার লোকসঙ্গীত ও ভাবতেব বিভিন্ন প্রাদেশিক ও বিদেশী সঙ্গীত। এর ভেতর উচ্চাঙ্গ হিন্দী সঙ্গীত তাঁকে খুব বেশী প্রভাবান্বিত করেছিল ও অনেক গান বচনাব প্রেবণা ও উপাদান তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকেই পেয়েছিলেন বা নিয়েছিলেন। এখানে উপাদান বলতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাগ বাগিণী ও তাব বিভিন্ন গীতবীতিব আঙ্গিক বা কাঠামোকে বোঝাচ্ছে।

এ কথাটা সকলেবই জানা আছে যে ববীন্দ্রনাথেব শৈশব কেটেছিল এমন এক সঙ্গীতমুখব পবিবেশে যেখানে তাঁব তৎকালীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেব শ্রেষ্ঠ সব গুণীদেব গান শোনবাব সুযোগ হয়েছিল। বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যদুভট্ট, বাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সে যুগেব বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞবা সঙ্গীত পবিবেশন বা সঙ্গীত শিক্ষাদানেব জন্যে প্রায়ই ঠাকুববাড়িতে যাতায়াত কবতেন। তাঁদেব গান শুনে ববীন্দ্রনাথেব মনে অতি শৈশবকাল থেকেই হিন্দুস্থানী গানেব একটি ঠাট আপনা আপনিই জমে উঠেছিল। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেব বাগ ও বস সম্বন্ধে একটা সাধাবণ সংস্কাব তাঁব মনেব মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল ও তিনি হিন্দুস্থানী গানেব মহত্ব ও মাধুর্যকে সমস্ত মন দিয়েই স্বীকাব করে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টিতে সুবেব দিক দিয়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বাগ বাগিণী দ্বাবা ও আঙ্গিকেব দিক দিয়ে ধ্রুপদ সঙ্গীত দ্বাবা তিনি বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

তাঁর সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করলে তাতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় আশিটি রাগ রাগিণীর সাক্ষাৎ মেলে। এদের মধ্যে উনিশ-কুড়িটি রাগ রাগিণী, বিশেষ করে ইমন কল্যাণ, ছায়ানট, ভৈরবী, বেহাগ, কানাড়া, কাফি, হাম্বীর, মল্লার, পরজ – এই সব রাগের প্রভাবই সমধিক লক্ষ্য করা যায়। ভৈরবী ও বেহাগ রাগে তো তাঁকে এক প্রকার সিদ্ধ পুরুষই বলা চলে। এই দুই রাগে এত বিচিত্র সঙ্গীত সৃষ্টি করতে এর আগে কোনো ভারতীয় সঙ্গীত রচয়িতাকে দেখা যায়নি।

তাঁর হিন্দী ভাঙা গান ও রাগভিত্তিক গানগুলিকে যদি রচনা কাল ধরে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে তাঁর প্রথম দিককার রচনাতে শাস্ত্রনিষ্ঠা প্রবল। এই সব গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি রাগের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এবং ঐ সময়কার হিন্দী ভাঙা গানগুলি বেশীর ভাগ সময়েই মূল গানকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু যতই তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি পরিণতির দিকে এগিয়েছে ততই দেখা যায় যে তাঁর এই শাস্ত্রনিষ্ঠা ও শাস্ত্রানুগত্যের স্থান দখল করেছে কাব্যবোধ ও গানের ভাব। ফলে তাঁর মধ্যযুগের ও শেষদিকের গানে সঙ্গীতের কাব্যাংশকে পরিস্ফুট করার জন্যে দুই বা ততোধিক রাগ রাগিণীর মিলিত মিশ্র রূপের দেখা মেলে। এই রাগ মিশ্রণকেও শেষ সময়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে দেখা যায়, যার নজির ভারতীয় সঙ্গীতে বড় একটা মেলে না। যাকে একটা যুগান্তকারী ও দুঃসাহসিক চেষ্টা বলা যেতে পারে। অথচ মজা হল এই যে বাণীর সঙ্গে সুরের এমনতর অদ্ভুত সামঞ্জস্য রেখে এই সব মিশ্রণ করা হয়েছে ও বিভিন্ন রাগ রাগিণী পরস্পরের সঙ্গে মিলে ভাব ও রসের দিক দিয়ে একাত্ম হয়ে এমন এক অখণ্ড সঙ্গীতের রূপ নিয়েছে যে রাগ রাগিণীর মিশ্রণের এই প্রচেষ্টা নজরেই পড়ে না, সেটা নেপথ্যেই নেপথ্যে থেকে যায়। এই ভাবে মিশ্র রাগের এই সব গানগুলি সার্থক শিল্প সৃষ্টি হয়ে উঠতে পেরেছে।

ববীন্দ্রসঙ্গীতে বাগ রাগিণীব ব্যবহাবের তাৎপর্য বুঝতে হলে ভারতায় সঙ্গীতের ধাবা সম্বন্ধেও একটু আলোচনা প্রয়োজন।

বচনাব বিচারে ভাবতীয় সঙ্গীতকে তিনটি ধাবায ভাগ কবা চলে। প্রথম ভাগ হল নিছক সুবধর্মী গান। এই ধাবাব গানে কথা সুবেব আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র। দ্বিতীয় ভাগে হল কথা বা বাণীপ্রধান গান। তৃতীয ভাগে আমবা এমন সব গান পাই যাতে কথা ও সুব সমান মর্যাদাব অধিকাবী। ববীন্দ্রসঙ্গীত এই শেষোক্ত ধাবাব অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গাত বচনাব এই আদর্শটিকে বাঙালী তার সঙ্গাতে চিবকাল অনুসবণ কবে এসেছে। সে কখনও তাব গানকে অবাধ সুববিহাবেব স্বাধীনতা দিযে গানেব কাব্যাংশকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। এইখানেই সুবধর্মী হিন্দুস্থানা সঙ্গীতেব সঙ্গে বাংলা গানেব মূলগত প্রভেদ।

এই প্রসঙ্গে আমাদেব এই কথাটি বিশেষ ভাবে মনে বাখতে হবে যে ববীন্দ্রনাথ যদিও বিশ্বকবি ছিলেন, তাঁব বচিত গানেব বেলায কিন্তু তিনি ছিলেন পুবোপুবি বাঙালী। কখনও তিনি তাঁব বচিত গানকে সবভাবতীয রূপ দিতে চাননি। ববীন্দ্রনাথ তাঁব গানে বাগ বাগিণীব উপাদান গ্রহণ কবেছিলেন মাত্র। বাগ বাগিণীব কাঠামোটি বজায বেখে তার বাহুল্য ও আতিশয্যকে বর্জন কবে তবে তাদেব তাঁব গানে ব্যবহাব কবেছিলেন। বাগ বা শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিতে গিযে তাঁব গানেব কাব্যাংশকে তিনি কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এজন্যে অনেক বাগ বাগিণীকে তাঁব গানে ব্যবহাব কবতে গিযে গানেব ভাবকে পবিস্ফুট কবাব জন্যে তাদেব শাস্ত্রীয রূপকে অনেক সময় এদিক ওদিক কবতে হয়েছে। এইপ্রসঙ্গে 'সঙ্গীতেব উদ্দেশ্য' নামক এক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"যদি মধ্যমেব স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায আব তাতে বর্ণনীয ভাবেব সহাযতা কবে তবে জযজয়ন্তী বাঁচুন অথবা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বহাল বাখিব না কেন?" এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাগ বাগিণীকে তাঁব গানে ব্যবহাব কবেছিলেন বলে তাঁব দরবারী

কানাড়ায় রচিত গানে (এবার নীরব করে দাও হে) শুদ্ধ নিষাদের ব্যবহার দেখি, বেহাগে রচিত গানে (দাঁড়াও আমার আঁখির আগে) কোমল নিষাদের ব্যবহার পাওয়া যায়। বাগেশ্রীতে রচিত গানে (সঘন গহন রাত্রি) কোমল ধৈবতের প্রয়োগ দেখি ও বাহার রাগের গানে (আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে) শুদ্ধ গান্ধারের ও মালকোষে রচিত গানে (আনন্দধারা বহিছে ভুবনে) কোমল রে ও কড়ি মা-এর সন্ধান মেলে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রয়োগবিধি অনুসারে হয়তো উপরোক্ত ঐ সকল স্বরের প্রয়োগ খুব শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু ঐ সকল বর্জিত বা বিবাদি স্বর যে উপরোক্ত গানগুলির ভাব প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তা ঐ গানগুলির কথা ও সুরের সঙ্গতির দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে বিচার করলে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

রাগ রাগিণীর শাস্ত্রীয়রূপ অর্থাৎ তার আরোহন, অবরোহন, বাদী সম্বাদী পকড়—এইগুলি ছাড়াও এদের আর একটি রূপ তাঁর নিকট ধরা পড়েছিল—সেটি হল তাদের ভাব ব্যঞ্জনাময় রূপ। প্রাচীন কালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের নিকটও রাগ রাগিণী বা সঙ্গীতও এই ভাবেই ধরা দিয়েছিল। তাই ভৈরবী তাঁর কাছে শুধু কোমল 'রে গা ধা নি' যুক্ত সম্পূর্ণ শ্রেণীর রাগই নয়, সে হচ্ছে "সঙ্গ-বিহীন অসীমের চির বিরহ-বেদনা।" মুলতান শুধু কোমল রে, গা, ধা, ও কড়ি মা যুক্ত রাগই নয়, সে হচ্ছে "রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিঃশ্বাস।" পূরবী শুধু কোমল রে, ধা ও দুই মধ্যম যুক্ত রাগই নয়, সে হচ্ছে "শূন্য গৃহচারিণী বিধবার অশ্রুমোচন।"

রাগ রাগিণীর প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে এদেরকে তাঁর গানে ব্যবহার করার সময়ে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

অনেক সময়ে তাঁর গানে ব্যবহৃত রাগ রাগিণীর সঙ্গে উত্তর ভারতের প্রচলিত সেই সব রাগ রাগিণীর স্বরপ্রয়োগের পার্থক্য দেখা যায়। এইরূপ পার্থক্য দেখা যাবার অন্যতম কারণ হল এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে ঘরানায় রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন ত

হল বিষ্ণুপুরী ঘরানা, যার রাগ রাগিণীর সঙ্গে উত্তর ভারতের রাগ রাগিণীর স্বরগত অনেক প্রভেদ রয়েছে। এই জন্যে আমরা তাঁর ব্যবহৃত রামকেলী রাগে উত্তর ভারতে প্রচলিত কড়ি মা-এর ব্যবহার পাই না। বেহাগে কড়ি মা-এর ব্যবহার খুব কম দেখতে পাই ও তাঁর পূরবীর অধিকাংশ গানে শুদ্ধ ধা-এর প্রয়োগ দেখি। তাঁর শেষদিকের রচিত গানে অবশ্য বেহাগে কড়ি মা-এর এবং পূরবীতে কোমল ধৈবতের ছোঁয়াচ লেগেছে। তবে সেটা হয়েছে পরবর্তী কালে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ফলে।

তিনি রাগ রাগিণীর প্রয়োগ পদ্ধতি ও তাদের শাস্ত্রীয় রূপ বদলে ও ভেঙে দিয়ে তাঁর গানে ব্যবহার করেছিলেন বলে অনেকে তাঁকে উচ্চাঙ্গ ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী রূপে কল্পনা করে থাকেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি তাঁর গানে কথা ও সুরের সংমিশ্রণে বাংলা দেশে প্রচলিত ধারায় সঙ্গীত রচনা করলেও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মহত্ত্ব বা তার নিয়মানুবর্তিতাকে কোনদিনই অস্বীকার করেননি। সঙ্গীতে উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি কোনদিনই সমর্থন করেননি। এ জন্যে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ গীতরীতির ভিতর ধ্রুপদ গান, যাতে আছে গম্ভীরতা, আত্মদমন ও সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করার একটা নির্দিষ্ট নীতি—তা তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। হিন্দুস্থানী গানের কতকগুলো আদর্শকে তিনি খুবই মেনে চলতেন, যেমন — সময়, ঋতু ও প্রকৃতির সঙ্গে রাগের সম্পর্ক ও সেই অনুসারে তার ব্যবহার। এই বিষয়ে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অনুশাসনই বেশীর ভাগ সময় মেনে চলেছেন। তাই যে সব গানে সকালবেলাকার উল্লেখ আছে তাদের তিনি টোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, ভৈরব, যোগিয়া —এই সব সকালবেলাকার রাগ রাগিণীতে বেঁধেছেন। যে সব গানে সন্ধ্যাবেলার উল্লেখ আছে তাতে ব্যবহৃত হয়েছে সন্ধ্যায় গেয় পূরবী ও ইমন কল্যাণ রাগ। যে সব গানে রাত্রির উল্লেখ আছে তাতে দেখা দিয়েছে রাত্রিতে

গেয় রাগ—বেহাগ ও কানাড়া। যে সব গানে বসন্ত ঋতু বা বর্ষার বর্ণনা আছে তাতে তিনি বাহার বা মল্লার সুর বসিয়েছেন। এই ভাবে রাগ রাগিণীর প্রয়োগে তিনি তাঁর শাস্ত্রনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে রাগ রাগিণীর যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে ও সে বিষয়ে শাস্ত্রকারদের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়া বা তার নিয়ম না মেনে রাগ রাগিণীর যথেচ্ছ ব্যবহার যে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না তা তাঁর নীচের লেখা পড়লেই বোঝা যাবে।

"একটি সঙ্গীতকুশল লোক অর্দ্ধেক রাত্রে ভৈরোঁ আলাপ করতে লাগল, বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে অনেক জিনিস গ্রহণ করেছিলেন ও বহু রাগ রাগিণীকে তাঁর গানে ব্যবহার করেছিলেন বলে অনেকে তাঁর হিন্দী ভাষা ও রাগভিত্তিক গান গুলিকে হিন্দী গানের পর্যায়ভুক্ত করতে চান, যেমন রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ বা রবীন্দ্রনাথের খেয়াল। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এই ভাবে পর্যায়ভুক্ত করাটা একটা মারাত্মক ভুল হবে। কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দী সঙ্গীত থেকে বহু উপাদান গ্রহণ করলেও তা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর সঙ্গীত ও তাকে সেই ভাবেই বিচার করা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের কতখানি হিন্দী গানের আদর্শে গড়তে পেরেছিলেন এই আলোচনার চাইতে তিনি হিন্দী গানের উপাদান গ্রহণ করে তা দিয়ে বাংলা গানকে যে কি ভাবে সমৃদ্ধতর করে গেছেন—সেটাই আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। অনেক পুরোনো রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি বইয়ে দেখতে পাই তাঁর গানগুলির এক একটি রাগের নাম দিয়ে তাদের এক একটি নির্দিষ্ট রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার মতে এটা ঠিক হয়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথ

"টোড়ীতে বা বেহাগে গান লিখিব" এই ভেবে নির্দিষ্ট রাগকে অবলম্বন করে কখনই গান লিখতে বসেননি। তাঁর গানে কাব্যাংশ বরাবরই প্রাধান্য পেয়েছে ও গানের কাব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে রাগ রাগিণীর যতখানি সাহায্যের প্রয়োজন তাই তিনি নিয়েছেন। তাঁর গানকে ভাব অনুসারে বিবেচনা না করে তাদের নির্দিষ্ট রাগ রাগিণীতে শ্রেণীবদ্ধ করে রাগ রাগিণী প্রধান করে তোলার কোনো অর্থ হয় না।

বাংলা গানে আজকাল অনেকে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের আদর্শে বাংলা গান রচনা করছেন। তাতে স্বর-বিহারের স্বাধীনতা দিয়ে তান বাট সরগম—এই সব অলংকরণের সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ হিন্দী গানের আদর্শে গঠিত এই সব রাগপ্রধান গান যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসোত্তীর্ণ হচ্ছে না, তা বোধ করি সকলেই স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক গানের সঙ্গে এই সকল রাগপ্রধান গানের তফাৎ হল এই যে, নামে বাংলা গান হলেও কার্যতঃ এইগুলি হিন্দী গানের তর্জমা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দী গানের সব উপাদান গ্রহণ করেও কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে রসোত্তীর্ণ হয়ে বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব একটি সম্পদে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তার গানে বহু রাগ রাগিণীর মিশ্রণ করে তাদের বিচিত্র ভাবে ব্যবহার করে গেছেন। এই অপূর্ব মিশ্রণের ফলে এমন অনেক সুরের সাক্ষাৎ মেলে যাদের স্বতন্ত্র ও নূতন রাগ রাগিণীর মর্যাদা দেওয়া চলে বা যাদের থেকে অনেক নূতন নূতন রাগ রাগিণীর সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞগণ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রবীন্দ্রনাথের হিন্দী ভাঙা বা রাগ মিশ্রণে রচিত রাগভিত্তিক গান-গুলিকে বিশ্লেষণ করেন তবে হয়তো অনেক নূতন রাগ রাগিণীর সন্ধান দিতে পারবেন। কারণ যুগে যুগে এইভাবেই মার্গসঙ্গীত লোক-সঙ্গীত থেকে তার উপাদানের সন্ধান পেয়েছে, বহু রাগ রাগিণীর জন্ম এইভাবে লোকসঙ্গীত থেকে হয়েছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার স্থান

রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকসঙ্গীত, প্রাদেশিক সঙ্গীত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে তিনটি ধারার সঙ্গম ঘটেছে তার মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারাটি বোধহয় সবচাইতে প্রবল ও শক্তিমান। তাঁর রচিত গানের এক বিরাট অংশ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতরীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালোভাবে বুঝতে হলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত রাগ রাগিণী ও তার বিভিন্ন গীতরীতির সঙ্গে পরিচয় থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এটা ভুললে চলবে না যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই হল বাংলা দেশের সঙ্গীত সহ ভারতীয় সঙ্গীতের মূলাধার। রবীন্দ্রনাথও এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাংলা দেশের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব হচ্ছে গান অর্থাৎ বাণী ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপ। কিন্তু এই রূপকে সর্বদা প্রাণবান করে রাখতে হলে হিন্দুস্থানী উৎস ধারার সঙ্গে তার যোগ রাখা চাই। আমাদের দেশে কীর্তন ও বাউল গানের বিশেষ এক স্বাতন্ত্র ছিল। তবুও স্বাতন্ত্র দেহের দিকে, প্রাণের দিক ভিতরে ভিতরে রাগ রাগিণীর সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি।"

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উৎস ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ না করলে যে বাংলা দেশের সঙ্গীত ও তার নিজস্ব সৃষ্ট গানকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করা বা সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করা যাবে না—এটা বুঝেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন।

গোড়ার দিকে অনেকের মধ্যে এইরূপ একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানার কোনোই প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে সম্প্রতি এই ধারণার

পারিবর্তন ঘটেছে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে কলকাতার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে যদিও ঐ শিক্ষায়তনগুলিতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এর পাঠক্রম অত্যন্ত মামুলী ও গতানুগতিক করে রাখা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাদান শুধু স্বরসাধনাতেই সীমাবদ্ধ। আর যেখানে তাকে আরও একটু ব্যাপক ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে কতগুলো রাগ রাগিণীর আরোহন অবরোহন শেখাবার ব্যবস্থা ছাড়া, রাগ রাগিণীগুলোকে ভালো ভাবে চেনবার ব্যবস্থা করা, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতরীতির সঙ্গে পরিচয় করানো বা রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ রাগিণীর প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোকসম্পাত করে উচ্চাঙ্গ ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমন্বয়—এইগুলির কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি বললেই চলে।

শুধু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্যে তো আলাদা স্কুলই রয়েছে, আমরা যদি সেই স্কুলে অনুসৃত মামুলি রাস্তা ধরেই চলি ও তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনের উপযোগী করে ঢেলে না সাজাই, তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা যে অনেকাংশে কমে যাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং আজ বিশেষ ভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে কি করে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পাঠক্রম এই ভাবে রচনা করা যায় যাতে এটা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে ও গীতরচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে সাহায্য করবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠক্রম রচনা করবার কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ছে যে একে মোটামুটি ভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যেতে পারে। এই তিন ভাগ হল যথাক্রমে স্বর সাধনা, রাগ রাগিণী ও বিভিন্ন গীতরীতির সঙ্গে পরিচয় করানো এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের রাগ রাগিণীর

প্রয়োগ বিশ্লেষণ করে গীত রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবদানকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করানো।

প্রথম ধরা যাক স্বরসাধনার কথা। স্বরসাধনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে কণ্ঠের স্বরস্থান ঠিক করা ও ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরসমূহ চেনা। স্বরস্থান ঠিক না হলে যে কোন সঙ্গীতই হউক না কেন, তা বেসুরো হবে ও তা সঙ্গীত পদবাচ্য হবে না।

সুতরাং স্বরস্থান ঠিক করা শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন সব সঙ্গীতেই অপরিহার্য। আর স্বরসমূহ চেনা তো রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, কারণ রবীন্দ্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্বরলিপির মাধ্যমেই করা হয়েছে। স্বরসমূহ ভালো ভাবে না চিনলে বা উচ্চারণ করতে না পারলে স্বরলিপি পাঠ বা কোন গানের স্বরলিপি করা বা তাকে নির্ভুল ভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

স্বরস্থান ঠিক করা বা স্বরসমূহ চেনা ছাড়াও স্বর সাধনার ব্যাপারে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ থাকে—সেটা হল কণ্ঠস্বরকে নানা প্রক্রিয়া ও অলঙ্করণের মাধ্যমে সঙ্গীতের উপযোগী করে তোলা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এতে কতকগুলো স্বর অলঙ্কার, যথা—মীড়, আশ, টপ্পার গোটা গোটা তান আর বিশেষ শ্রুতির ব্যবহারের প্রাধান্য রয়েছে। তাছাড়া স্বরে স্থিতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রধানতঃ ভাব সঙ্গীত বলে কাব্যাংশের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্যে স্বরের ওজনের বিশেষ নিয়ন্ত্রণের (volume controlling power) প্রক্রিয়ারও বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অবশ্য স্বরসাধনা খুব ব্যাপক ভাবে করা হয়ে থাকে। খেয়ালে ব্যবহৃত দ্রুত তান কর্তবে ও ধ্রুপদের ভারী গমকের কাজের পিছনে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরসাধনায় এই দুটো অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য কাজ বাদ দিয়েও করা চলে। আর এটাও মনে রাখতে হবে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বেলায় স্বরে

যতখানি weight বা ওজনের প্রয়োজন হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বা কাব্য-সঙ্গীতে ততখানি 'ওজনের' প্রয়োজন হয় না।

যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন তাঁরা জানেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কতকগুলো বিশেষ স্বরবিন্যাসের, যথা—মাপাধাপামাপাজ্ঞ, মাণধাণিসা́, মাপাণাজ্ঞা, মাপাণপানিসা́, পাধাসাণধপমজ্ঞ, মাপা-ণধাপমপ ইত্যাদি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে। চেষ্টা করলে এইরূপ আরো বহু স্বরবিন্যাস পাওয়া যেতে পারে যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে অধিক ব্যবহৃত হয়েছে ও যাদের রাগোপযোগী করে সাজিয়ে স্বরবিন্যাস অভ্যাস করালে শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হতে পারে।

এরপর আসছে রাগ রাগিণী ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গীতরীতির সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করানোর কাজ।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের রাগ রাগিণীর নির্বাচন যতটা সম্ভব রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে লক্ষ্য রেখে করা দরকার, অর্থাৎ যে সব রাগ রাগিণী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় ছিল ও যা তাঁর গানে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে তার ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রাগ রাগিণীর আরোহন, অবরোহন, পকড়—এই সব ছাড়াও তাদের এক বিশেষ চলন বা ভঙ্গী আছে, যা থেকে তাদের চেহারাটা ধরা পড়ে। এই চেহারাটা চেনাই ছাত্র ছাত্রীদের বেশী প্রয়োজন, কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে রাগের যথাযথ শাস্ত্রীয় রূপের চাইতে এই মূল চেহারাটাকেই বেশী ব্যবহার করেছেন। সুতরাং রাগের মূল চেহারাটার সঙ্গে পরিচয়, যা থেকে জন্মায় রাগ বোধ তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ তা না হলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ রাগিণীর প্রয়োগ, বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ—এই সব জিনিসের সম্যক উপলব্ধি করা কখনোই সম্ভব হবে না।

এই রাগ বোধটা জন্মানো যায় প্রধানতঃ গানের মাধ্যমে ও রাগের ওপর কিছু কিছু আলাপ বিস্তার করে বা শুনিয়ে। যিনি শিক্ষক তিনি বিভিন্ন রাগের ওপর গঠিত হিন্দুস্থানী গান, রাগভিত্তিক

রবীন্দ্রসঙ্গীত বা রাগপ্রধান অন্যান্য বাংলা গান গেয়ে ও তাতে কিছু বিস্তার করে রাগ পরিচয় জিজ্ঞেস করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রাগ চেনার কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

রবীন্দ্রনাথের বহু গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতরীতির গান ভেঙে বা তাদের শৈলীর আদর্শে তৈরি হয়েছে। তাদের মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গ গানের সংখ্যাই বোধ হয় সর্বাধিক। তাছাড়া খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের বেশ কিছু গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। ঠুংরী অঙ্গের ২।৪টি গানও যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারে না পাওয়া যাবে তাও নয়। এই সব গীতরীতির আদর্শে গঠিত গান গাইতে হলে ঐ সব গীতরীতির কলাকৌশল ও তাল আয়ত্ব করা প্রয়োজন। তা না হলে ঐ সব গান কখনই সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হবে না।

মধ্যমান তালে গান গাওয়া অভ্যাস আছে—কিন্তু কোন টপ্পার আদর্শে গঠিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ঐ তালে ফেলে গাইলে তা গানের কাব্যাংশকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সেই প্রকার গানকে তালে না ফেলে গাওয়া এক জিনিস, আর মধ্যমান তাল আয়ত্তে নেই সুতরাং 'গুরুদেব এই সব গান তালে ফেলে গাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না' -এই নজিরের দোহাই দিয়ে তালের সঙ্গে গান করা এড়িয়ে যাওয়া অন্য জিনিস।

সুতরাং সুষ্ঠু ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করার জন্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতরীতির সঙ্গে পরিচয় ও ঐ সব গীতরীতির কলা-কৌশল জানা নিতান্ত প্রয়োজন, কারণ বেসুরো, বেতালা ও সঙ্গীতের কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, কোন সঙ্গীতই সঠিক ভাবে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথও চেয়ে-ছিলেন যে হিন্দুস্থানী গীতরীতিতে নিপুণ অথচ তার অন্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত ও বাংলা গানের প্রতি দরদী—এরূপ সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা তাঁর সঙ্গীতের প্রচার হোক ; কারণ শুধু কণ্ঠলাবণ্যকে মূলধন করে যে সব অশিক্ষিত পটু সঙ্গীতজ্ঞ রয়েছেন তাঁদের হাতে তাঁর সঙ্গীতের প্রচারের

ভার দিলে পরিণাম যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন।

এরপর আসছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ রাগিণী প্রয়োগ, তালের মিশ্রণ ইত্যাদির বিশ্লেষণ। এই কাজ করাটা খুব সহজসাধ্য নয় কারণ যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিখিয়ে থাকেন, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কোন ধারণা বা আগ্রহ প্রায় সময়েই থাকে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী করে কণ্ঠসাধনা করানো রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ রাগিণীর প্রয়োগ, রাগের মিশ্রণ —এই সব বিষয় বিশ্লেষণ ও শিক্ষাদান করা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সমভাবে জানেন। কিন্তু সেরূপ শিক্ষক আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। আমাদের মধ্যে ক'জন এরূপ গাইয়ে আছেন যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত ও তার মূল হিন্দুস্থানী গানটি যথাক্রমে পুরো রাবীন্দ্রিক ও হিন্দুস্থানী ঢং-এ গেয়ে দেখাতে পারেন?

রবীন্দ্রনাথের রাগভিত্তিক গানগুলোকে রচনার কাল ধরে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে পাওয়া যাবে সেই সব গান যাতে শাস্ত্রনিষ্ঠা প্রবল। দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যাবে এমন সব গান যাতে আমরা দেখব যে তাঁর এই শাস্ত্রনিষ্ঠা ও শাস্ত্রানুগত্যের স্থান দখল করেছে কাব্যবোধ ও গানের ভাব। ফলে তাঁর মধ্যযুগের গানে সঙ্গীতের কাব্যাংশকে পরিস্ফুট করবার জন্যে দুই বা ততোধিক রাগ রাগিণীর মিশ্র রূপের দেখা মেলে। এই রাগ মিশ্রণকেও শেষ দিকে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছতে দেখা যায় যার নজীর ভারতীয় সঙ্গীতে বড় একটা মেলে না। সঙ্গীত রচনার এই ধারা ও বিকাশ তাঁর কোন একটি নির্দিষ্ট রাগের ওপর বিভিন্ন সময়ে রচিত গান বিশ্লেষণ করলে পরিস্ফুট হবে।

হিন্দুস্থানী গানের উপাদান গ্রহণ করে তাঁর গানকে সমৃদ্ধতর করবার সময় রবীন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে সাধারণ ভাবে মেনেই চলেছেন। তবুও এই শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে

চলবার ভেতরেই রাগ রাগিণীর মূল সুরটিকে ক্ষুণ্ণ না করে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উপাদানকে বিচিত্র ভাবে তাঁর গানে যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন তা এক পরম উপভোগ্য গবেষণার বিষয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এই বিচিত্র প্রয়োগের উপর অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গবেষণার ব্যবস্থা হলে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, বাংলা গানের পক্ষেও হবে একটা মূল্যবান পদক্ষেপ হবে। কারণ বাংলা গানের আজ বড় দুর্দিন। একদিকে রয়েছে আধুনিক গান বলে এক বিচিত্র সৃষ্টি, যার সঙ্গে বাংলা দেশের সংস্কৃতির বিশেষ কোন যোগ নেই —অন্যদিকে রয়েছে রাগপ্রধান গান বলে এক প্রকার বাংলা গান, যা নামে বাংলা গান হলেও কার্যতঃ হিন্দুস্থানী গানের তর্জমা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রবীন্দ্রনাথও হিন্দুস্থানী গান ভেঙে বা হিন্দুস্থানী গানের আদর্শে বহু গান রচনা করেছেন, কিন্তু কখনও হিন্দুস্থানী গানের প্রভাবের দ্বারা তাঁর গানের বাঙ্গালীয়ানাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এইখানেই বাংলা গানের রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব। তাঁর এই সঙ্গীত রচনার আদর্শ বোধহয় হিন্দুস্থানী গানের অন্ধ অনুকরণের মোহ থেকে আমাদের অনেককে রক্ষা করতে পারে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতই বাংলা সঙ্গীতের শেষ কথা—এ কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। আমরা আশা করব যে অদূর ভবিষ্যতে বাংলা দেশে এমন শক্তিধর ও প্রতিভাবান সঙ্গীত রচয়িতাদের আবির্ভাব হবে যাঁরা বাংলা সঙ্গীতকে নব নব সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাবেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো যদি রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্লেষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করে মুমূর্ষু বাংলা গানের প্রাণধারার মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চারে সাহায্য করতে পারে, তবে সেটাই হবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের চরম সার্থকতা। সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী

কিছুদিন ধরে শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতে কতখানি স্বাধীনতা নিতে বা পেতে পারেন, তা নিয়ে জোর বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কটা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এটা মূলতঃ দুটো মতবাদে বিভক্ত। এদের মধ্যে এক দল বলছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের ওপর অতটা বাধা নিষেধ আরোপ করার কোন মানে হয় না। এই সমস্ত বাধা নিষেধ আরোপ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তোলা হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এই প্রকার বাধা নিষেধ ও তাকে একটা নির্দিষ্ট সুরে বেঁধে দেওয়াকে অনেকে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার শিল্পীর স্বাধীনতায় বাধা নিষেধ আরোপ করার পিছনে একটা কায়েমী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের গন্ধও পান।

আবার অন্য দল বলেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কোন বাধা নিষেধ আরোপ না করে যদি শিল্পীদের যথেচ্ছ ভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করবার স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এই দুটো মতবাদকে পরীক্ষা করে দেখবার আগে আমাদের একটা বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে গোড়াতেই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমতঃ, আমাদের পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যে শিল্পী বলতে এখানে কাদের বোঝাচ্ছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বা এই জাতীয় সব সঙ্গীতের বেলাতেই পরিবেশনের দুটো দিক আছে—একটি ঘরোয়া বা আটপৌরে আর একটা দিক হল তার প্রদর্শনীমূলক পরিবেশন।

স্বাধীনতা পেতে পারেন সে বিষয়ে বিচার করা বা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে একটু খতিয়ে দেখা যাক কবির মতামতটা কি। (নিম্নে উদ্ধৃত কবির মতামত বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'সঙ্গীত চিন্তা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত)।

তাঁর গানে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে শিল্পীদের কোন স্বাধীনতা দেওয়া হবে কি না এই প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—এ কথা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না।

তুমি বলবে আমাদের দেশের গানের বৈশিষ্ট্যই তাই, গায়কের রুচি ও শক্তিকে সে দরাজ জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু সর্বত্র এ কথা খাটে না। খাটে কোথায়? যেখানে গানের চেয়ে রাগিণীই প্রধান, রাগিণী জিনিসটা জলের ধারা; বস্তুত সেইরকম আকৃতি-পরিবর্তন দ্বারাই তার প্রকৃতির পরিচয়। কিন্তু আমি যাকে গান বলি সে হচ্ছে সজীব মূর্তি যে যেমন খুশি তার হাত পা নাক চোখের বদল করতে থাকলে জীবনের ধর্ম ও মূর্তির মূল প্রকৃতিকেই নষ্ট করা হয়। সে হয় কেমন? যেমন চাঁপা ফুল পছন্দ নয় বলে তাকে নিয়ে স্থলপদ্ম গড়বার চেষ্টা। সে স্থানে উচিত চাঁপার বাগান ত্যাগ করে স্থলপদ্মের বাগানে আসন পাতা। কারণ যে জিনিস জীবধর্মী তাকে উপেক্ষা করলেও চলে কিন্তু উৎপীড়ন করলে অন্যায় হয়।"

তাঁর গানে গাইয়েদের অতিরিক্ত কাজ বা অলংকার সংযোজনের প্রস্তাব বিবেচনা করতে বললে তিনি জবাব দিয়েছেন ......"আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠবো"।

গান যে সহজ সরল অলংকরণের দ্বারাই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে ও তাতে অলংকরণের বাহুল্য যে সব সময়েই তাকে খুব একটা শ্রী মণ্ডিত করে না। তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি

গান রচনা করতে করতে সে গান বারবার নিজের কানে শুনতে শুনতেই বুঝেছি যে দরকার নেই প্রভূত কারুকৌশলের। যথার্থ আনন্দ দেয় রূপের সম্পূর্ণতায়—অতি সূক্ষ্ম, অতি সহজ ভঙ্গিমার দ্বারাই সেই সম্পূর্ণতা জেগে ওঠে।"

অন্য এক জায়গায় বলেছেন, "সরস্বতীর কমলবনে সোনার পদ্ম আছে, সেখানে লোভীর মতো অনকোর এনকোর করে চিৎকার করা চলে না। বেনের দল যতই দুঃখিত হোক শতদলের উপর আর একটা পাপড়ি চাপানো চলবে না। সে আপন সম্পূর্ণতার মধ্যে থেমেছে বলেই সে অপরিসীম।"

কারও সঙ্গীত সৃষ্টির ওপর অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি বলেছেন, "বস্তুত আমি যেমন বিচারের অধিকারী, অন্য ব্যক্তিও তেমনি। এমন অবস্থায় সহজ মীমাংসা এই যে, যে ব্যক্তি গান রচনা করেছে তার সুরটিকে বহাল রাখা। কবির কাব্য সম্বন্ধেও এই রীতি প্রচলিত, চিত্রকরের চিত্র সম্বন্ধেও। রচনা যে করে রচিত পদার্থের দায়িত্ব একমাত্র তারই, তার সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধনের দায়িত্ব যদি আর কেউ নেয় তাহলে কলা জগতে অরাজকতা ঘটে।" কবির জীবদ্দশাতেই তাঁর গানে বিভিন্ন শিল্পীদের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন...... "আজ-কালকার অনেক রেডিও গায়কও অহঙ্কার করে বলে থাকেন তাঁরা আমার গানের উন্নতি করে থাকেন। মনে মনে বলি পরের গানের উন্নতি সাধনে প্রতিভার অপব্যয় না করে নিজের গানের রচনায় মন দিলে তাঁরা ধন্য হতে পারেন। সংসারে যদি উপদ্রব করতেই হয় তবে হিটলার প্রভৃতির ন্যায় নিজের নামের জোরে করাই ভালো।"

তাঁর গানে নানা বিকৃতির অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কবিগুরু এই ভাবে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন—"এখন এমন হয় যে আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা যেন আমার সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, পরের

মুখে নষ্ট হচ্ছে এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয় এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম।"

উপরে ব্যক্ত রবীন্দ্রনাথের মতামত পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর গানে শিল্পীদের অতিরিক্ত সংযোজন বা নিজেদের ইচ্ছামত করে গাইবার স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং এই বিষয়ে তাঁর মতামত দিনকে দিন কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কাঠামোকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ঢং-এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে অতিরিক্ত সুর সংযোজনের কথা অনেকে ভেবেছেন। মনে হয় গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের এতে কিছু অনুমোদনও ছিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত সংযোজনের অধিকার তিনি কখনই সাধারণ গাইয়েদের ওপর ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন এই কাজটা ক'জন গুণী যাঁদের পরিমিতি ও রুচিবোধের ওপর তাঁর আস্থা ছিল তাঁরাই করুন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "......অবশ্য যাঁরা সত্যকার গুণী তাঁদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম।" কিন্তু মনে হয় শেষ অবধি তিনি তাঁর মতের পরিবর্তন করেছিলেন বা যোগ্য কোন লোকের সন্ধান পাননি যার জন্য শেষ অবধি কারও ওপর এর ভার ন্যস্ত করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই সম্পর্কে কবির নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "ললিতকলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বর ওপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার ওপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।" মনে হয় গাইয়েদের এই দরদ ও ধর্মবুদ্ধির ওপরে কবি শেষ অবধি আস্থা রাখতে পারেন নি। এখন প্রশ্ন হল এই যে কবি যখন তাঁর জীবদ্দশায় কাউকে এর দায়িত্ব দেননি তখন তাঁর অবর্তমানে এই অধিকার প্রয়োগ করবে কে?

সম্প্রতি লক্ষ্য কবা যাচ্ছে যে কোন কোন সঙ্গীত সমালোচক কয়েকজন প্রবীণ ও বর্ষীয়ান গাইয়েকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কিছু অতিরিক্ত কাজ সংযোজন কববাব অধিকাব দেবাব প্রস্তাবকে সমর্থন কবছেন। কিন্তু এই কবে তাঁবা ঐ সব গাইযেদেব ববীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁদেব স্বকায় ঢং আমদানি ও কিছুটা পবিমাণে কয়েকটি ঘবানা সৃষ্টিব পবোক্ষ অনুমোদন কবছেন না কি ও ইতিমধ্যে একজন প্রবীণ ববীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ে তাঁব নিজস্ব-ঢং এ ববীন্দ্রসঙ্গীত পবিবেশনে কিছুটা বিভ্রান্তি ও বিতর্কেব সৃষ্টি কবেননি কি? ববীন্দ্রসঙ্গীতে তো শুধু একটা ঘবানা থাকবাবই কথা এবং সেটা হল ববীন্দ্র ঘবানা।

তাছাড়া তর্কেব খাতিবে যদি এটা মেনে নেওয়া যায় যে ঐ সব প্রবীণ ববীন্দ্রসঙ্গীত গাইযেদেব পবিমিতি ও কাণ্ডজ্ঞান থাকায় তাঁবা ববীন্দ্রসঙ্গীতে অতিবিক্ত কাজ সংযোজন কববাব অধিকাব পেতে পাবেন তো তাবপবও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, এঁদেব দোহাই দিযে যখন অন্যান্য সাধাবণ গাইযেবাও এই অধিকাব প্রয়োগ কবতে চাইবেন তখন তাঁদেব ঠেকাবে কে? এই অধিকাব প্রয়োগেব ফলে পববর্তী কালে গাইযে পবম্পবাব দুর্দম কণ্ঠতাড়নায ববীন্দ্রসঙ্গীতে ববীন্দ্রনাথেব হয়তো আব কিছুই বাকি থাকবে না।

এই ধাবাব গানেব পবিবেশনে যদি কোন বাধা নিষেধ না থাকে তবে কি পবিনাম হতে পাবে তাব নমুনা আমবা কাজী নজকল ইসলামেব গানেই দেখতে পাচ্ছি। একই নজকলেব গান অনেক সময়ে বিভিন্ন শিল্পী দ্বাবা বিভিন্ন ঢং-এ সুবান্তবিত হযে পবিবেশিত হতে দেখা যাচ্ছে ও এব ফলে বোঝাই মুশকিল হযে পড়ে যে ঐ সব গানে নজকল প্রদত্ত মূল সুব ও রূপটি কি?

এটা বোধহয সকলেই জানেন যে ববীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকায ও সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো এখন অবধি বেশীর ভাগ শিল্পী বজায় রাখায় ববীন্দ্রসঙ্গীতে একটা গায়কী গড়ে উঠেছে ও কোন না জানা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ও তাব লক্ষণ ও ঢং দেখে

আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চিনতে পারি। কিন্তু নজরুলের গান অনেকটা শিল্পীনির্ভর হওয়াতে ও তাতে শিল্পীর কিছুটা স্বাধীনতা থাকাতে তাতে কোন সুনির্দিষ্ট গায়কী গড়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও সেই অবস্থায় এনে ফেলাটা কতটা সমীচীন হবে আশা করি সকলেই তা ভেবে দেখবেন।

নজীর হিসেবে অনেকে রাধিকা গোস্বামী ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি গুণীদের নাম উল্লেখ করে থাকেন। এঁদের নাকি রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান ইচ্ছামত পরিবেশন করবার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য যে ঐ সব শিল্পীরা যখন রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অতটা প্রসার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়তো তখন কিছুটা সংশয় থেকে থাকতে পারে যে জনসাধারণ তাঁর গান ঠিকমত নেবে কিনা। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারের কথা ভেবে ও ঐ সব গুণীদের রুচিবোধ ও পরিমিতি বোধের ওপর তাঁর আস্থা থাকায়, তিনি হয়তো তাঁদের সেই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু কালক্রমে যখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত রেডিও ও বিশেষ করে সিনেমার দৌলতে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করল তখন রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হলেন ও তাঁর গানের রূপ এই ব্যাপক বিস্তৃতিতে যাতে সাধারণ গাইয়েদের হাতে পড়ে নষ্ট না হয় সেজন্যে তিনি নিজে সব গানের রেকর্ড শুনে অনুমোদন শুরু করলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড কর্তৃক সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের অনুমোদনের ব্যবস্থা হল।

কিছুদিন আগে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে অতীত স্মৃতি অনুষ্ঠানে গৌরকিশোর ঘোষ সেই যুগের কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন যখন শিল্পীরা যেভাবে ইচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করতে পারতেন ও যখন তার কোন অনুমোদনের বালাই ছিল না। ঐ অনুষ্ঠানে আমরা তাতে পেলাম শ্রী কে মল্লিকের নিজস্ব সুরে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি ও

জনৈক শিল্পী রবীন্দ্রনাথের 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না' গানটি যেভাবে যাত্রার দলের ঢং-এর কনসার্টের সহযোগিতায় পরিবেশন করলেন তা বোধহয় বর্তমান যুগেও কল্পনা করা যায় না। ঐ সব গাওয়া গানের নজীর দেখিয়ে কেউ যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে আবার সেই নৈরাজ্যের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তো সেটা কি খুব সমর্থন যোগ্য হবে?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রত্যেকটি গানের বেলাতেই যদি স্বরলিপির নির্দেশ হুবহু মেনে চলতে হয় তবে শিল্পীর স্বাধীনতা রইল কোথায়? এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন একান্ত ভাবে কবিগুরুর নিজস্ব সৃষ্টি এবং খেয়াল বা ঠুংরার মত সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা নয় বা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শিল্পী বা গুণীর অবদানে পুষ্ট হয়েছে, তখন তার পরিবেশনে কিছুটা বাধা নিষেধ থাকাটা স্বাভাবিক ও মূল রচনার বাইরে যাওয়ার অধিকার পরিবেশনকারী শিল্পীর পক্ষে থাকাটা খুব স্বাভাবিক এবং সঙ্গতও নয়। পাশ্চাত্য দেশেও আমরা দেখি যে প্রখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতাদের সঙ্গীত সৃষ্টিতে পরিবর্তন বা অতিরিক্ত সংযোজনের কথা কেউ ভাবতেই পারেন না এবং তা তাদের সেখানকার সুধীসমাজ কখনই ক্ষমা বা বরদাস্ত করে না।

তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন-ধারার কিছুটা পরিমাণ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া স্বরগত ভাবে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এক হলেও যে সব শিল্পীরা তা পরিবেশন করেন তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের দিক দিয়ে ঠিক এক নন। সুতরাং তাঁদের গান একই স্বরলিপিতে অনুসরণ করলেও মেজাজ ও ভাব ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্ন হতেই পারে এবং শিল্পীর তাতে একটা জিনিস ফুটে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বকীয়তা'। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধহয় এইটুকুই শিল্পীর স্বাধীনতা। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর

দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষ গুণের বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না।" তাঁর গানে শিল্পীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন, "...তোমার এ কথা আমিও স্বীকার করি যে সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্‌সপ্রেশনে কমবেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার গায়কের আছে। কেবল প্রতিভা অনুসারে কম ও বেশীর মধ্যে তফাৎ আছে এ কথাটি ভুলো না। প্রতিভাবানকে যে স্বাধীনতা দেব অকুণ্ঠে, গড়পড়তা গায়ক ততখানি স্বাধীনতা চাইলে না করতেই হবে।"

এখন প্রশ্ন হল যে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তার সঠিক রূপে কি করে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে? অনেকেই হয়তো বলবেন, কেন স্বরলিপি তো রয়েছে। কিন্তু মনে হয় এ ব্যাপারে শুধু স্বরলিপিই যথেষ্ট রক্ষাকবচ নয়। কারণ স্বরলিপিতে থাকে শুধু গানের কাঠামোটি এবং তা থেকে গায়কী শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত তুলে নিতে পারেন তাঁরাই যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে এসেছেন। কিন্তু যাঁরা তা করেননি তাঁরা স্বরলিপি দেখে গান তুললে হয়তো শুধু স্বরগত ভাবে গানটি তাঁদের কণ্ঠে আসতে পারে, কিন্তু এর গায়কী তাঁদের কণ্ঠে না-ও ধরা পড়তে পারে। তাছাড়া কোন গানের স্বরলিপিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও তাকে বিকৃত করা যায় ও আজকাল অনেক বিকৃতিই এই ভাবে লোকের চোখ এড়িয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুপ্রবেশ করছে এবং এগুলো সাধারণত হল গানের লয়কে অনাবশ্যক ভাবে কমানো বা বাড়ানো, স্বরে অযথা কম্পনের প্রয়োগ, গানের মূল তালকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে নানা আড়িকুয়াড়ী প্রয়োগ করে গানের স্বচ্ছন্দ গতি ও তার কাব্যময় রূপকে ব্যাহত করা, গানের প্রথম লাইন থেকে না ধরে তার মাঝখান থেকে ধরা ও গানে বেশী ভাব আরোপ করে তাকে অতিনাটকীয় করে তোলা ইত্যাদি। কোন স্বরে বিচ্যুতি অর্থাৎ কোমল ধা এর স্থলে শুদ্ধ ধা লাগালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী তাতে যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত

হয় তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঐ সব বৈচিত্র্য প্রয়োগ দ্বারা। সুতরাং স্বরলিপির সঙ্গে চাই এইসব সঙ্গীতের বিশুদ্ধ ও সঠিক গীতিরূপ ও সেটা সম্ভব হতে পারে দুই উপায়ে।

(ক) যে সব রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের উচিত হবে উপযুক্ত শিষ্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করে যাওয়া, যাতে তাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক গায়কী রূপটি কণ্ঠে ধারণ করে তাঁদের শিষ্য পরম্পরায় পরবর্তী যুগে সেই গায়কীর ধারাটি প্রবহমান রাখতে পারেন। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অনেকগুলো প্রদীপ জ্বালানো যায়, তেমনি এক একটি কণ্ঠ থেকে শত শত কণ্ঠে সেই সব গান তাদের বিশুদ্ধ রূপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(খ) রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের দ্বারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বা টেপরেকর্ড করিয়ে তা সংরক্ষিত করতে হবে। এ কাজে বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী হতে পারেন এবং এ কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় শিল্পীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামতকে কেউ যদি অত্যন্ত বেশী সংরক্ষণশীল ও ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে করেন তো তিনি স্বচ্ছন্দে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বর্জন করে ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে বাংলা গান রচনা করে তাতে শিল্পীদের অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে বাংলা গানের নূতন দিগন্ত খুলে দিতে পারেন। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব, তাতে অর্থ কামাব, যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করব, কিন্তু এর পরিবেশনায় তার স্রষ্টা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা বা নির্দেশকে মানব না এরূপ মনোভাব অত্যন্ত আপত্তিকর।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব ও জনপ্রিয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে কিনা তা একমাত্র মহাকালই নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু যতদিন এ গান বাঁচবে, ততদিনই সে তার অবিকৃত স্বরূপেই বেঁচে

থাকুক—এটাই কাম্য। কবিগুরুও তাই চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার গান যাতে আমার গান বলে মনে হয় এইটি তোমরা করো। আরও হাজারো গান হয়তো আছে তাদের মাটি করে দাও না, আমার দুঃখ নেই। কিন্তু তোমাদের কাছে আমার মিনতি—তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনেও আমি আমার গান বলে চিনতে পারি।"

অনেকে প্রগতির দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে সংশোধন ও যুগোপযোগী করে তাকে ঢেলে সাজাবার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে থাকেন। বাংলা গানে প্রগতির একটা মানে হতে পারে কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রগতির অর্থটা যে কি তা আমার সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে। চিত্রশিল্পে বা নাটকেও প্রগতির একটা অর্থ হতে পারে। কিন্তু সেই প্রগতিটা কি হবে অজন্তা ইলোরার শিল্পসৃষ্টিকে সংস্কার করে বা ইবসেন বা সেক্সপীয়ারের নাটকগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জনা করে, না নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে?

শিল্পীদের তাঁর গানে অতিরিক্ত সংযোজন বা স্বাধীনতা নেবার প্রচেষ্টার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কতটা স্পর্শকাতর ছিলেন তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই বোঝা যাবে—

"আমাদের দেশের গায়ক কথায় কথায় রচয়িতার অধিকার নিয়ে থাকে তখন সে সৃষ্টিকর্তার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরী প্রকাশ করে।"

সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিল্পীরাও রবীন্দ্রসঙ্গীতে খোদার ওপর খোদকারী বা স্রষ্টার কাঁধের ওপর চড়ে ব্যায়াম কর্তার বাহাদুরীর প্রচেষ্টাটা যত কম করেন ততই মঙ্গল।

সাপ্তাহিক অমৃতে আমার এই প্রবন্ধ বের হবার পর ঐ পত্রিকাতেই এই লেখার ওপর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ও আমিও তার জবাব দিই। এই প্রবন্ধের বক্তব্য আরো ভাল ভাবে পরিস্ফুট হবে এই আশায় ঐ চিঠি ও তার প্রত্যুত্তরে আমার জবাব নীচে উদ্ধৃত করা হল ঃ

গত ১৪ই মার্চ 'অমৃতে' প্রকাশিত শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মজুমদারের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্রষ্টা বনাম শিল্পী' নামক বিতর্কিত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমার কিছু মতামত প্রকাশের বাসনা রাখি।

ইদানীং রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে শিল্পীদের স্বাধীনতা কতখানি সে সম্পর্কে একটা গুঞ্জন শ্রোতা সাধারণ্যে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র ও নিবন্ধ মারফৎ প্রায়শঃই শোনা যায়। এবং ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে দুটো মতবাদও রূপ নিচ্ছে বলে অনুমান করি।

কিন্তু আমার বক্তব্য আপনাদের সাপ্তাহিকে প্রকাশিত নিবন্ধটির কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে। সেটা হল প্রবন্ধকার এক জায়গায় লিখেছেন—"সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কোন কোন সঙ্গীত সমালোচক কয়েকজন প্রবীণ ও বর্ষীয়ান গাইয়েকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কিছু কিছু অতিরিক্ত কাজ সংযোজন করবার অধিকার দেবার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই করে তাঁরা ঐ সব গাইয়েদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তাঁদের স্বকীয় ঢং আমদানী ও কিছুটা পরিমাণে কয়েকটি ঘরানা সৃষ্টির পরোক্ষ অনুমোদন করছেন না কি? এই প্রসঙ্গে তিনি একজন প্রবীণ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েকে নিজস্ব ঢং-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের জন্য প্রকারান্তরে দায়ী করেছেন।"

আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য রবীন্দ্রনাথ কি কোথাও এমন কথা বলে গেছেন যে, সমস্ত গানই তাঁর কণ্ঠস্বরের অনুকরণ বা অনুসরণে গাইতে হবে অথবা নির্দিষ্ট কিছু গাইয়ে বা ট্রেণারের শিক্ষাপদ্ধতি অনুযায়ী গাইতে হবে?

কিছুকাল পূর্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ক্লান্তিকর মেজাজে গান রপ্ত করার (নাকি শিক্ষকের অনুকরণ?) রেওয়াজ ছিল। যার ফলে বেশীর ভাগ সচেতন শ্রোতার কাছেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার ছিল। তা সত্ত্বেও সেই রেওয়াজটা এপিডেমিকের মতই ক্রমশঃ ছড়িয়ে গিয়েছিল। যার ফলে রবীন্দ্রকাব্য পাঠকের চেয়ে শ্রোতা অনেক কমে গিয়েছিল। সেই

অক্ষমতা বা এপিডেমিকের হাত থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত আজও রেহাই পায়নি।

কিন্তু স্বয়ং স্রষ্টা কি এই রীতিটা প্রবর্তন বা অনুমোদন করে গিয়েছিলেন? এটাও কি এক ধরণের স্টীম রোলার চালানো নয়? সেদিক থেকে এই সব বর্ষীয়ান গাইয়েরা তাঁদের শর্তের ক্ষেত্রে অনেক সৎ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও তাতে যে সুর আরোপিত আছে, তাকে ভাবে ও রসে মূর্ত করে তোলাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়ের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত বলেই আমার মনে হয়। তাতে গায়কের নিজস্ব কিছু মেজাজ বা আবেগ থাকলে আমার বিশ্বাস সেই গান মূর্ত হয়ে উঠবারই অবকাশ পাবে, এবং সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সার্থক। নচেৎ শত চেষ্টায়ও এবং ট্রেণারের শত নিষেধ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি সততা থাকলেও সেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে উঠবে না। আমাদের ভুললে চলবে না যে, যিনি সার্থক গাইয়ে তিনি নিজেও কমবেশী একজন স্রষ্টা। তাঁর স্বকীয়তা সৃষ্টিকে সার্থকই করে। তবে অতিরিক্ত সুর সংযোজন অর্থাৎ যেটা সেই গানের পক্ষে অপরিহার্য নয়, সে ক্ষেত্রে সেই ধরণের ঝোঁক না থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানের ক্ষেত্রে একথা নিশ্চয়ই খাটে না। সেখানে রাগের বিস্তার বা অতিরিক্ত তান যোগ হতেই পারে।

আর একটি প্রশ্ন "রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকায় ও সৌভাগ্যক্রমে সেগুলো এখন অবধি বেশীর ভাগ শিল্পী বজায় রাখায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে একটা গায়কী গড়ে উঠেছে।" —আমার জিজ্ঞাস্য সেটা কি? অর্থাৎ কিছু পপুলার গায়ক কিংবা গায়িকার রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের ঢংটাই কি রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও সুর বোঝার পক্ষে যথেষ্ট? গায়ক কিংবা গায়িকার নিজস্ব কোন সত্ত্বাই কি তবে থাকতে পারবে না রবীন্দ্রনাথের গানে? এবং সেটাই কি স্বয়ং স্রষ্টার উদ্দেশ্য ছিল?

এগুলি অবশ্যই আমার নিজস্ব মতামত। প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ,

তিনি এমন একটি বিতর্কিত প্রবন্ধ লিখে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বলে।

কানাই সামন্ত
কলিকাতা-৬

সবিনয় নিবেদন,

গত ২রা মে-এর 'অমৃতে' আমার ১৪ই মার্চের প্রবন্ধের ওপর শ্রীযুক্ত কানাই সামন্তের চিঠিখানা পড়লাম। এই পত্রে শ্রীযুক্ত সামন্ত কিছু মতামত ও প্রতিবাদ প্রকাশ করেছেন আমার প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্যের ওপর। তাঁর এই সব মতামত ব্যক্তিগত ও কোন কোন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতের পরিপন্থী হলেও সেগুলির জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছি।

শ্রীযুক্ত সামন্তের প্রথম জিজ্ঞাসা যে রবীন্দ্রনাথ কোথাও এমন কথা বলে গেছেন কিনা যে সমস্ত গানই তাঁর "কণ্ঠস্বর" অনুকরণ বা অনুসরণে গাইতে হবে। এর উত্তরে জানাই, না, রবীন্দ্রনাথ কোথাও এমন কথা বলেননি, আমি আমার আলোচ্য প্রবন্ধেও এমন কথা বলিনি ও যার একটু সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান আছে সে-ও এইরূপ উদ্ভট কথা বলবে না। নির্দিষ্ট কিছু গাইয়ে বা ট্রেণারের শিক্ষা বা পদ্ধতি অনুযায়ী কবির গান গাওয়া সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে অন্যান্য ধারার সঙ্গীতের মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতেও বিশেষভাবে ট্রেণিং-এর বিশেষ দাম আছে ও রাম, শ্যাম, যদু, মধুর কাছ থেকে ট্রেণিং প্রাপ্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইয়েদের চেয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের (যথা দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনাদিকুমার দাস্তদার, শৈলজা রঞ্জন মজুমদার ও শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ) কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের শিক্ষাটা যে অধিকতর সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে তা তো জানা কথা। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের কোন হুকুমনামা বা নির্দেশনামার প্রয়োজন হবে কেন ? যে সমস্ত শিল্পী অত্যন্ত ক্লান্তিকর মেজাজে শুধু স্বরলিপিকে অনুসরণ করে গান করে থাকেন তাঁরাই

হলেন যথার্থ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী—এমন কথা তো আমি আমার প্রবন্ধে কোথাও বলিনি। সুতরাং শ্রীযুক্ত সামন্তের এই প্রসঙ্গ অবতারণার তাৎপর্য বুঝলাম না। তবে আমি এটাও মানতে অপারগ যে, যে সমস্ত বর্ষীয়ান শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাঁদের নিজস্ব অরাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য আমদানী করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রয়াসী, তাঁরাই হলেন এঁদের চেয়ে সার্থক ও সৎ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী।

শ্রীযুক্ত সামন্ত মন্তব্য করেছেন যে রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী গানে রাগের বিস্তার বা অতিরিক্ত তান যোগ হতেই পারে। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মত কিন্তু তা নয়। আমার আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিয়েছি যে গোড়ার দিকে শিল্পীদের অনুরূপ স্বাধীনতা দেবার ইচ্ছা থাকলেও শেষ অবধি অবস্থা বিপর্যয়ে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। এই বিষয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন ধারক ও বাহক স্বর্গত অনাদিকুমার দস্তিদার যা বলেছিলেন তা খুব প্রাসঙ্গিক হবে বলে এখানে উদ্ধৃত করছি :—

> "কিছুদিন যাবৎ উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত নামে একটি জিনিস শুনতে পাই। অর্থাৎ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল বা টপ্পা জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি ঠিক ঠিক মার্গসঙ্গীতের ঢং বাট, হুন, তান প্রভৃতি যোগে গাওয়া হয়ে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এর প্রয়োজন দেখি না। তেমন শিক্ষা বা যোগ্যতাই বা ক'জনের আছে। ব্যর্থ প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের গানকে বিপথগামী, অশ্রাব্য বা অশ্রদ্ধেয় করে কোন লাভ নেই। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তান, বাট যোগ করে দিতে পারতেন। কোন কোন গানের অংশ বিশেষে তিনি সেরূপ করেছেনও। সুতরাং আমার অনুরোধ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে কেউ শোধরাবার অথবা **improve** করার চেষ্টা না করেন।"

শ্রীযুক্ত সামন্ত প্রশ্ন করেছেন যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কী বলতে কি

বোঝায়? আমি এর উত্তরে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, শ্রীমতী নীলিমা সেন বা শ্রীযুক্ত সুবিনয় রায় যখন রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন একটি গান পরিবেশন করেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের গানই হুবহু ঠিক এক রকম হয় না—কারণ ঐ পরিবেশিত গানে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তার প্রভাব থাকে। কিন্তু তা সত্বেও ঐ চারজনের পরিবেশিত গানটি যে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত তা আমাদের চিনে নিতে এতটুকুও অসুবিধা হয় না। কারণ প্রত্যেকেব পবিবেশিত গানে শিল্পীনিরপেক্ষ এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চিহ্নিত করে দেয়। ঐ যে বৈশিষ্ট্য, যা প্রত্যেক সার্থক রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীর গানে প্রায় একই ভাবে ধরা পড়ে, তাকেই আমি বলছি রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যেই রবীন্দ্রনাথের কোন অজানা গানকেও আমরা সহজেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চিনে নিতে পারি।

শ্রীযুক্ত সামন্ত প্রশ্ন করেছেন—'গায়ক কিংবা গায়িকাব নিজস্ব কোন সত্তাই কি তবে থাকতে পাববে না রবীন্দ্রনাথের গানে?' এর উত্তরে আমার আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি :—

'স্বরগতভাবে প্রত্যেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এক হলেও যে-সব শিল্পী তা পরিবেশন করেন, তাঁরা ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের দিক দিয়ে ঠিক এক নন। সুতরাং তাঁদের গান একই স্বরলিপিকে অনুসরণ করলেও মেজাজ ও ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়ে কিছুটা ভিন্ন হতেই পারে এবং শিল্পীর তাতে একটা জিনিস ফুটে ওঠা খুবই স্বাভাবিক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন স্বকীয়তা। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বোধহয় এইটুকুই শিল্পীর স্বাধীনতা।'

আমার উপরোক্ত মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত সামন্তের এই প্রশ্ন তোলাটা একটু নিরর্থক ও অবাস্তর নয় কি?

দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার
কলিকাতা-১৪

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে সাম্প্রতিক কিছু প্রবণতা

সম্প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনে এমন কিছু প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যাতে এটা যথেষ্ট আশঙ্কা করার কারণ ঘটেছে যে শুধু স্বরলিপি রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ প্রচার ও সংরক্ষণে রক্ষাকবচের কাজ করতে পারবে না—এর জন্যে উপযুক্ত জনমত গঠন ও রুচির পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে এমন একটি প্রবণতার কথা, যা বর্তমানে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনে আত্মপ্রকাশ করছে ও যা কালক্রমে হয়তো এর সঠিক প্রচার ও সংরক্ষণের পথে একটা বাধা স্বরূপ হয়ে দেখা দিতে পারে।

আমরা সবাই জানি যে স্বরলিপিতে থাকে শুধু গানের কাঠামোটি এবং তার থেকে গায়কী শুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত গলায় তুলে নিতে পারেন তাঁরাই যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করে এসেছেন। কিন্তু যাঁরা তা করেননি তাঁরা শুধু স্বরলিপি থেকে গান তুললে হয়তো স্বরগতভাবে গানটি তাঁদের কণ্ঠে আসবে, কিন্তু এর গায়কী তাঁদের কণ্ঠে ধরা না-ও পড়তে পারে। এই গেল শুধু স্বরলিপির মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঠিক ধারা বজায় রাখার সমস্যা। কিন্তু এখানে আমি আরো একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে চাই, সেটি হল এই যে স্বরলিপি অক্ষুণ্ণ রেখেও কোন গানের গায়কীকে বিকৃত করা যায় ও আজকাল অনেক বিকৃতিই এইভাবে বৈচিত্র্যের ছাড়পত্র পেয়ে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুপ্রবেশ করছে। এই সমস্ত বিকৃতি হল সাধারণত গানের লয়কে অনাবশ্যকভাবে কমানো বা বাড়ানো, স্বরে অযথা কম্পনের প্রয়োগ, উচ্চারণের বিকৃতি, গানের মূল তালকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে আড়ি কুয়াড়ীর ছন্দ প্রয়োগ করে গানের স্বচ্ছন্দ

গতি ও তার কাব্যময় রূপকে ব্যাহত করা, গানকে গীতাংশের প্রথম লাইন থেকে না ধরে তার মাঝখান থেকে ধরা, গানে বেশী ভাব আরোপ করে তাকে নাটকীয় করে তোলা ইত্যাদি। কোন স্বরে বিচ্যুতি অর্থাৎ কোমল ধা এর স্থলে শুদ্ধ ধা লাগালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী তাতে যতটা না ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ঐ সব বৈচিত্র্য প্রয়োগের ফলে।

সুরকারের সুর বজায় রেখে গানের মূল রূপ বা কাঠামোকে জখম না করে এক্সপ্রেশনে কম বেশী স্বাধীনতা চাইবার এক্তিয়ার তাঁর গানে গায়কের আছে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন। যে সব বৈচিত্র্য তথা বিকৃতির কথা উপরে বলা হল সেগুলো যদি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মূল রূপকে জখম না করে তাকে সমৃদ্ধতর করত তাহলে না হয় ঐগুলোর প্রয়োগ বা আমদানীকে সমর্থন করা যেতো। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঐসব তথাকথিত বৈচিত্র্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল রূপকে ও তার ভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে বলে ঐগুলোর প্রয়োগ আরো আপত্তিকর।

অধুনা আর একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিক্কার গান, এমন কি অনেক গান যা পুরোপুরি তাঁরই রচনা কিনা সন্দেহ আছে (যথা —'তুমি আছ কোন্ পাড়া', 'সেই তো বসন্ত ফিরে এল', 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন' ইত্যাদি) তাদেরও, নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনার অজুহাতে, বহুল প্রচারে কিছু শিল্পী বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। অবশ্য ঐসব গান, যখন গীতবিতান ও স্বরবিতানে স্থান পেয়েছে, তখন তাদের রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় বলে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বিচার্য যে ঐ সব গান, যা রবীন্দ্রনাথের একেবারে শিক্ষানবীশ কালে রচিত ও যা অনেক সময়েই পুরোপুরি কবির রচনাও নয় ও যা রবীন্দ্রপ্রতিভার পুরো স্বাক্ষরও বহন করে না, তাদের বহুল প্রচারে পরবর্তীকালে সত্যিকার রাবীন্দ্রিক সৃষ্টির ভাবময় রূপ বিশেষ ভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও ঐ সমস্ত গানের বেশী উপস্থাপনা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যথার্থ ও সত্যিকার রূপটি যে কি সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু এ ছাড়াও ঐ গানের বহুল প্রচারের আর একটি কুফল হচ্ছে এই যে কিছু লোক ঐ সব গানের (যাদের সৃষ্টিতে অন্যদের প্রভাব রয়েছে) নজীর দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথের গীতধর্মী কবিতায় (যাতে কবি সুরারোপ করে যাননি) অন্যদের দিয়ে সুর বসিয়ে এদেরকেও "রবীন্দ্র সঙ্গীত" বলে প্রচার করবার দাবী করছেন। এই ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল এই যে রবীন্দ্রনাথের তো এমন অনেক গান আছে যার সৃষ্টিতে অন্যদের প্রভাব রয়েছে ও যাদের রচনায় কবি অন্যদের গানের সুর ও কিছু ক্ষেত্রে তালের সাহায্য নিয়েছেন। সেই সব গানকে যদি আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে মেনে নিয়ে থাকি তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমানে অন্যদের দ্বারা সুর আরোপিত হলে তাদেরকেও রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে বাধাটা কোথায়?

উপরোক্ত যুক্তির গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করতে হলে আমাদের রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিক্‌কার রচিত গানগুলির গঠন, প্রকৃতি ও তাদের সৃষ্টিকালীন অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নেবার প্রয়োজন হবে।

রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিকের সঙ্গীত সৃষ্টিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে রয়েছে এমন সব গান যাদের সৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয় চৌধুরী প্রভৃতির প্রভাব ছিল।

দ্বিতীয় ভাগে আছে এমন সব গান যা পরবর্তীকালে রচিত— যাদের আমরা ভাঙা গান বলি ও যা অন্যদের দ্বারা রচিত গানকে ভেঙে তাদের সুর ও তালের সাহায্যে রচিত হয়েছে। প্রথম ভাগের গান সম্বন্ধে এটা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে যদিও ঐ সব গানে অন্যদের প্রভাব আছে, তাহলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ঐ সব গান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী ও

রবীন্দ্রনাথ—এঁরা সকলে একত্রে বসে রচনা করেছেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে ঐ সব গানের সৃষ্টিতে কথা ও সুর—দুইয়েতেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল ও কথা বা সুর কোনটাই তাঁর অগোচরে রচিত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুর দেন তো ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই যে এতে কথাটা থাকবে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু এর সুরে তিনি থাকবেন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সুতরাং এই জাতীয় গানকে রবীন্দ্রনাথের গোড়ার দিক্‌কার ঐ সকল সৃষ্টির সঙ্গে কি করে তুলনা করা চলতে পারে ও ঐ সকল গানের নজীরে বর্তমানে সুরারোপিত গানকেও রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে গণ্য করবার দাবী উঠতে পারে তা বোঝা দুষ্কর।

দ্বিতীয় ভাগের গান অন্যদের গানের সুর ও তালের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও, তাদেরকেও আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতই বলি। কারণ ঐ সকল গানের রচয়িতা ও সুরকার দুই-ই রবীন্দ্রনাথ নিজে, ও অন্যদের গান ভাঙলেও এই ব্যাপারে যা কিছু করণীয় তা তিনি নিজেই করেছেন, ও ঐ সকল গানের কথা ও সুরসৃষ্টির দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের একারই।

অন্যদের গান ভেঙে বা তাদের গানের সুর বা তালের সাহায্য নিয়ে গান রচনার নজীর তো নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের মত অতুলপ্রসাদ, নজরুল এঁরাও এইভাবে অন্যদের গান ভেঙে অনেক গান রচনা করেছেন। অতুলপ্রসাদের 'সে ভাবে আমারে' গানখানি শুনলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে সেটি ভৈরবীতে রচিত হিন্দী গান 'ভবানী দয়ানী মহাবাক্‌বাণী'-র উপর ভিত্তি করে রচিত। সুতরাং কেউ যদি এই অজুহাতে এখন অতুলপ্রসাদের কোন কবিতায় সুর বসিয়ে তাকে অতুলপ্রসাদের গান বলে চালাবার দাবী করেন, সেটা কি খুব সমর্থনযোগ্য হবে? তাছাড়া এটা তো সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধিকাংশ ভাঙা গানই সুর ও সাহিত্যে মূল গানের রূপান্তর ঘটিয়েছেন ও 'হৃদয় নন্দনবনে' বা 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল'

সদৃশ কয়েকটি গানকে বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল গানের নবজন্ম ঘটেছে তাঁর সৃষ্টিতে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এমন কিছু সংখ্যক গান আছে, যার কথা রবীন্দ্রনাথের নয়, কিন্তু সুর দিয়েছেন তিনি (যথা —বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর', গোবিন্দদাসের 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' ইত্যাদি) ও যেহেতু এগুলি তাঁর দ্বারা সুরারোপিত, সেইজন্যে সুরের বিচারে এগুলি স্বর-বিতানে স্থান পেয়েছে। আমরা সাধারণত দেখি যে কোন গীতি-রূপের গুণাগুণ প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাতে প্রদত্ত সুরের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ে থাকে। অনেক সময়ই কোন গীতিরূপের যাতে কথা ও সুর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, সুরের বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ্য রেখে যিনি তাতে সুরারোপ করেছেন, তাঁর নাম অনুসারেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন অনেক গানকে হিমাংশু-গীতি বলা হয়ে থাকে যার সুরকার ৺হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, কিন্তু কথা অন্যের। এইভাবে অনেক গান চিহ্নিত হয়ে আসছে ৺সুধীর-লাল চক্রবর্তীর নামে, যার সুরকার ৺সুধীরলাল কিন্তু গীতিকার নন। এইভাবে গানকে চিহ্নিত করার গুণাগুণের বিচারের মধ্যে না গিয়েও এইটুকু বলা চলে যে কোন গানের গীতিরূপের মধ্যে তার সুরটা চিরকালই প্রাধান্য পেয়ে আসছে। সুতরাং সেই বিচারে এই মূল উপাদানের অর্থাৎ সুরের মধ্যেই যদি রবীন্দ্রনাথ না থাকেনও এর প্রয়োগে তাঁর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোন যোগই না থাকে তো সে সমস্ত গানকে কি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলা চলে ?

উপসংহারে আর একটি প্রবণতার কথা বলব যা হল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে আনুষঙ্গ বা সহযোগী যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে। তাঁর গানের সঙ্গে সহযোগী যন্ত্রের ব্যবহার করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটা সুস্পষ্ট মতামত ছিল ও উত্তরকালে তিনি এই ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তকেই আমাদের এই

ব্যাপারে তাঁর চরম নির্দেশ বলে মানতে হবে। তাঁর এই সিদ্ধান্ত হল এই যে তার গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ছড়টানা যন্ত্র, যথা এস্রাজ, বেহালা, সারেঙ্গী ও বাঁশি এবং তাল যন্ত্রের মধ্যে খোল, পাখোয়াজ—এ সবই বেশী বাজবে। তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়াম ব্যবহার করার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ও তাঁরই চেষ্টায় রেডিও থেকে হারমোনিয়াম যন্ত্রটির নির্বাসন ঘটে (যদিও সেটা এখন আবার চালু হয়েছে) ও শেষ পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতন হারমোনিয়াম ব্যবহার করতে দেননি।

কিন্তু কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে কিছু নামী ও দামী শিল্পী (এঁদের মধ্যে এমন শিল্পীরাও রয়েছেন যাঁরা শান্তিনিকেতনেই রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিখেছেন ও কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভও করেছেন) রবীন্দ্র-নাথের উপরোক্ত নির্দেশকে উপেক্ষা করে তাঁদের পরিবেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে কবিগুরুর যে সব যন্ত্রের ব্যবহারে আপত্তি ছিল, তা পুনরায় চালু করেছেন। শুধু তাই নয়, হারমোনিয়াম ছাড়াও গীটার, পিয়ানো, পিয়ানো একোর্ডিয়ান ও অন্যান্য বিদেশী যন্ত্র ব্যবহার করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের আবহ সঙ্গীতে একটা অ-রাবীন্দ্রিক কোলাহল আমদানী করে বাজারদর বাড়াবার চেষ্টা চলছে। তাছাড়া গানের সঙ্গে তবলার দাপাদাপি তো আছেই।

যাঁরা এইসব করেছেন তাঁদের যুক্তি হল এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে গোড়ার দিকে পিয়ানো, অর্গ্যান, হারমোনিয়াম এই সব যন্ত্র ব্যবহার হত ও অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পিয়ানোবাদন থেকে নির্গলিত সুরধারা। কিন্তু ওই সব মতামত প্রকাশ করার সময় সম্ভবত তাঁরা ভুলে যান যে ঐ সময়টা ছিল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবীশ কাল, সুতরাং তাঁর সেই সময়কার কোন মতামত বা অভ্যাসকে কবির পরিণত বা চূড়ান্ত মত বলে গণ্য করা চলে না—এ ব্যাপারে তাঁর পরিণত বয়সের মতামতকেই (যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) প্রামাণ্য বলে গণ্য করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যে কিছু ওস্তাদপন্থী ব্যক্তিও এক কালে অনুরূপ ভাবে কবির একটা কাঁচা ও অপরিণত মতকে প্রামাণ্য বলে প্রচার করে তাঁর গানে নানা প্রকার অলঙ্করণ সংযোজনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কবির সেই অপরিণত মতটা ছিল, "গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেই-খানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যতই কম থাকে ততই ভালো। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী যেখানে শুধুমাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ।" (জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১১৭)

কিন্তু সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছিলেন ও বাংলা গানে কথা ও সুরের মিলিত অর্ধনারীশ্বর রূপকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি বলে-ছিলেন, "আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতি বিরুদ্ধ।" (সাঙ্গীতিকি—পৃঃ ১৩২)

রবীন্দ্রনাথের এই দুই পরস্পর-বিরোধী মত থাকায় নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তখন শ্রীদিলীপকুমার রায় কবিকে লেখেন যে তাঁর আগের মত ভুল ছিল একথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে, কেননা পত্রিকাদিতে তার ঐ কাঁচা মতটি পাকা বলেই জাহির করেছেন সব ওস্তাদপন্থী সুরবেত্তারা। কবি যে তাঁর প্রাগৈতিহাসিক মত বদলেছেন সেটা স্পষ্ট করে বলা নিতান্ত দরকার।

তার উত্তরে কবি তাঁকে লেখেন—

"কল্যাণীয়েষু দিলীপ

মত বদলিয়েছি। জীবন-স্মৃতি অনেক কাল পূর্বের লেখা। তারপর বয়েসও এগিয়ে চলেছে, অভিজ্ঞতাও। বৃহৎ জগতের চিন্তাধারা ও কর্মচক্র যেখানে চলছে সেখানকার পরিচয়ও প্রশস্ততর হয়েছে। দেখেছি চিত্ত যেখানে প্রাণবান সেখানে সে জ্ঞানালোকে ভাবলোকে ও কর্মলোকে নিত্যনতুন প্রবর্তনার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, মানুষ সৃষ্টিকর্তা, কীটপতঙ্গের মত একই শিল্প প্যাটার্ণের পুনরাবৃত্তি করছে না। ......মত বদলিয়েছি কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই। সৃষ্টিকর্তা যদি বার বার মত না বদলাতেন তাহলে আজকের দিনের সঙ্গীত সভা ডাইনোসরের ধ্রুপদী গর্জনে মুখরিত হত এবং সেখানে চতুর্দন্ত ম্যামথের চতুষ্পদী নৃত্য এমন ভীষণ হত যে যারা আজ নৃত্যকলায় পালোয়ানীর পক্ষপাতী, তারাও দিত দৌড়। শেষ দিন পর্যন্ত যদি আমার মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তাহলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে। নইলে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন কর্তব্য। আমাদের দেশে সেই শান-বাঁধানো ঘাটেই লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (সাঙ্গীতিকি—পৃঃ ১৮-১৯)

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবি শেষ অব্দি বাংলা গানে কথা ও সুরের সম-মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁর মত বদলাননি।

ভাবি যে রবীন্দ্রনাথ যদি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন ও তাঁকে কিছু লোকের তাঁর গোড়ার দিককার সঙ্গীত রচনার সময় ব্যবহৃত যন্ত্রাদির ও হারমোনিয়াম ইত্যাদির তাঁর গানের সঙ্গে পুনঃ প্রবর্তন করার পক্ষের যুক্তিগুলো জানানো যেত তবে বোধহয় তাঁর কাছ থেকে অনুরূপ আরেকটি অপরূপ ও সরস চিঠি বা মন্তব্য উপহার পাওয়া যেত।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আমাদের জীবনে তার সর্বাত্মক প্রভাব।

আমরা অনেক সময়ে দেখে থাকি যে কোন যুগের কোন এক বিশেষ ধারার গান সেই যুগেই শুধু চালু ও জনপ্রিয় থাকে, কিন্তু পরবর্তী যুগে তার আবেদন ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে। এই ভাবেই এক কালের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় অনেক বাংলা গান আজ শ্রোতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত ও তা আমাদের মনকে এখন আর টানে না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে এমন এক অসাধারণ গুণ আছে যা তাকে রচনার পরবর্তী যুগেও সমভাবে আকর্ষণীয় করে রেখেছে ও যা সমকালকে গ্রহণ করেও সমকালোত্তীর্ণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই যে গুণ তাকে ক্লাসিক্যাল সাহিত্য যা—যুগে যুগে মানব সমাজকে সমভাবে আনন্দ দিয়ে চলেছে তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্তমানে আমাদের জীবনে এক অপরিহার্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গীতের প্রভাব ও ব্যপ্তি আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে দিন দিন বেড়েই চলেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই যে প্রভাব একে ভালো করে বুঝতে হলে ও তার সঠিক মূল্যায়ণ করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই যুগে যখন সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব। সে যুগে বাংলা গানের কি অবস্থা! তখন পল্লী অঞ্চলে যদিও কিছু কীর্তন শ্যামাসঙ্গীত বাউল গান ইত্যাদির প্রচলন ছিল কিন্তু শহরাঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বা অন্য কোন কারণেই হউক এই প্রকার সঙ্গীতের প্রভাব কমে আসছিল। কিছু সংখ্যক ধর্মমূলক গান ছাড়া ভদ্র সমাজে গাইবার মতো কোন গান বাংলা ভাষায় ছিল না বললেই চলে। 'আয় লো অলি কুসুম কলি' জাতীয় কিছু গান ছিল যা ভদ্র সন্তানেরাও গাইত আবার কুলী মজুর গাড়োয়ানেরাও গাইত। পরিবারের সকলে

একত্রে মিলে গাইবার মতো কোন গান ছিল না। গানটা ছিল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেশাদার গাইয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জাগরণে ঠাকুরবাড়ির অবদানের কথা সর্বজনবিদিত। বাংলা গানের এই দৈন্য ও অভাব মোচনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অগ্রজরা এগিয়ে এলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর সমাজের উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদির জন্যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হল। ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তখন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় ব্রতী হলেন।

এ ছাড়া হিন্দুমেলার জন্মকাল থেকে জোঁড়াসাকো ঠাকুরবাড়ি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় জাগরণের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। একদিকে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা চলছে, অন্যদিকে জাতীয় সঙ্গীত রচনার কাজও চলছে। তাছাড়া তখন নাটক রচনা ও তার অভিনয়াদির প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। নাটকে গান চাই—সে জন্যে তার উপযোগী গান রচনারও আয়োজন চলছে। এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকার গান রচনায় বয়সে নবীন হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। এই ভাবে সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হল। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ প্রচেষ্টায় বাল্মিকী প্রতিভা, মায়ার খেলা—এই সব গীতিবহুল নাটক রচনা করেন। এরপর কবির গান রচনার আর বিরাম ছিল না —এবং যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন অজস্র গান রচনা করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

গান জিনিসটা অনেকটা স্বতঃ উৎসারিত। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে কৃত্রিম আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্যে সেই স্বতঃস্ফূর্তি ভাবটা চাপা পড়ে যায়। আমরা যখন গান করতে বসি তখন আমাদের নানাবিধ আয়োজন ও উপকরণের দরকার হয়। হারমোনিয়াম চাই, তানপুরা চাই, চাই তবলা। তাছাড়া রয়েছে গান আরম্ভ করবার আগে বিরক্তিকর সেই যন্ত্র বাঁধা ও তবলা বাঁধার

ঠোকাঠুকি। এগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীতকে একটা কৃত্রিম ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানে' পরিণত করে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে নানাবিধ আয়োজন ও উৎসব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে সহজ ও স্বাভাবিক স্তরে এনে দিয়েছেন। তাঁর গানকে কণ্ঠে ধারণ করলেই হল, তার আর কোন উপকরণের প্রয়োজন নেই। সে গান পথ চলতে চলতে কাজ করতে করতে সব অবস্থাতেই গাওয়া চলে। নিত্যকার গৃহ কাজের সঙ্গে সব অবস্থাতেই খাপ খেয়ে যায়। কোন অবস্থাতেই বেমানান মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের এই ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছেন—"আমার গান আপন মনের গান—তাতে আনন্দ পাই শুনলে আনন্দ হয়। গান হবে যাতে যারা আশে পাশে থাকে তারা খুশি হয়; আত্মীয় স্বজন যারা অফিস থেকে আসছে দূর থেকে শুনতে পেলেও এটা তাদের জন্যেও জানো। ঘরে মাঝে মাঝে ঝগড়াও তো হয়—গান ঘরের মধ্যে মাধুরী পাওয়ার জন্যে, বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই। ভাবনা হচ্ছে যাঁবা গানকে সাদাসিধে রূপে মনের আনন্দের জন্যে পেতে চায় তাদের জন্যে।"

রবীন্দ্রনাথেরও জীবন ব্যাপী সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি সুন্দরকে মহৎকে আপন আপন গণ্ডি থেকে মুক্ত করে এনে মানুষের নিত্যকার জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি যেমন শিক্ষাকে বইয়ের গণ্ডি থেকে, ধর্মকে শাস্ত্র ও অনুশাসনের গণ্ডি থেকে, রাজনীতিকে বক্তৃতা ও শ্লোগানের কচকচি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তেমনি সঙ্গীতকে ওস্তাদী ও কালোয়াতির কবল থেকে মুক্ত করে এনে তাকে মানুষের সহজ জীবন যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাইতো আজ আমাদের নিত্যকার জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে। আমরা আমাদের জীবন-যাত্রা শুরু করতে পারি "হে চিরনূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার গানে" গানটি গেয়ে ও

আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে 'সমুখে শান্তি পারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার' গানটি দিয়েই। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের নিত্যসঙ্গী ও আমরা সব উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়েই। বিবাহ অনুষ্ঠানে গাই 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি', জন্মোৎসবে গাই 'ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়'। মৃত্যু বার্ষিকীতে গাই 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু'। কোন অনুষ্ঠান শুরু করি 'সবারে করি আহ্বান' গান গেয়ে। কোন শুভ কাজে ব্রতী হওয়ার আগে গাই 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'। কোন মহৎ ব্যক্তিকে স্মরণ করতে গিয়ে গাই 'মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি'। জীবনে যার হতাশা নেমে এসেছে সেও আশায় বুক বাঁধে 'জীবনে যত পূজা হল না সারা জানি জানি তাও হয়নি হারা' গানটি গেয়েই। মৃত্যু-পথযাত্রীও শান্তি পায় 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো' গানটি শুনে। এমন কি ব্রাহ্মধর্মভুক্ত লোকেদের বিবাহে মন্ত্রের স্থানও বর্তমানে অনেকাংশে অধিকার করে আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জন গণ মন অধিনায়ক' তাঁরই অবদান। আর একটি গান যা জাতীয় সঙ্গীতের সম মর্যাদাভুক্ত অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম্', তারও সুরকার তিনিই। বাংলাদেশও জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে বেছে নিয়েছে তাঁরই অনুপম সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। একই কবির রচিত গান দুইটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হওয়ার আর কোন নজীর আছে বলে আমরা জানিনে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বাংলা দেশ যখন প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল, সেই আন্দোলনের পুরোভাগে বসে কবি বৃটিশ রাজকে হুঁশিয়ার করে দিলেন কোন বক্তৃতা না দিয়ে 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান' গানটি গেয়েই।

স্বাধীনতা সংগ্রাম সব দেশেই হয়েছে—তাতে কামান বন্দুকের গর্জন ও জনগণের হুংকারই শোনা গেছে বেশী। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ

আন্দোলন অভিনব রূপমণ্ডিত হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের মাধ্যমে। তখন রাখীবন্ধন ও রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান মিলে যে একটা শ্রীমণ্ডিত রূপ দিয়েছিল পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বোধহয় তার কোন তুলনা নেই। তাছাড়া জাতির যখনই কোন দুর্দিন বা তার ওপর কোন আঘাত এসেছে তখনই সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে তার মুখর প্রতিবাদ এসেছে কবিগুরুর গানের মাধ্যমেই। যতীন দাস যখন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দীর্ঘদিন অনশনের পর কারাগারে মৃত্যুবরণ করলেন তখন সমগ্র জাতির ক্ষোভ ও ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'সর্ব খর্ব তারে দহে তব ক্রোধ দাহ' কবিগুরুর এই গানটির মাধ্যমে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের যখন আবির্ভাব তখন সঙ্গীতছুট ভদ্রসমাজের পক্ষে ভদ্রতা বজায় রাখাই কঠিন ছিল। তখন আমোদ-প্রমোদ অনুষ্ঠান হয় নীরস, না হয় রুচি বিগর্হিত কুশ্রী খেউড়ে পরিণত হত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রচনা করে এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বাংলার ভদ্রসমাজকে রক্ষা করেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত আজ আমাদের জীবন থেকে বহুলাংশে স্থূলতা দূর করেছে। আমাদের সব উৎসব অনুষ্ঠানকে সরস ও শ্রীমণ্ডিত করেছে। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত সমাজ সংস্কারকের কাজ করেছে বলা চলে।

পরবর্তীকালে কবি যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশ্রম স্থাপন করলেন, তখন তিনি সঙ্গীতকেই করলেন বিদ্যাচর্চার প্রধান বাহন। প্রকৃতি পাঠের শিক্ষা দিয়েছেন গানের মাধ্যমে, বিভিন্ন ঋতুর বিচিত্র সম্ভার গানের মাধ্যমেই আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরেছেন। বহু নতুন অনুষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসব আজ শুধু শান্তিনিকেতনেই আবদ্ধ নেই—সারা দেশে প্রতিপালিত হচ্ছে। বর্ষামঙ্গল, বসন্ত-উৎসব এখন তো হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সুষমামণ্ডিত অভিব্যক্তি।

বিদ্যালয়ের কাজকে যেমন গানের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন, পরবর্তীকালে যখন শ্রীনিকেতনে গ্রাম সংগঠনের কাজে হাত দেন তখন তিনি সঙ্গীতকেই কাজের বাহন করেছিলেন। ছেলেমেয়েদের যেমন ডেকেছিলেন খেলার নিমন্ত্রণে তেমনি গ্রামের লোকেদের ডাকলেন কাজেব নিমন্ত্রণে। কিন্তু সে কাজ গায়ের জোরে নয়, গানের সুরে—'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজে'। ছাত্ররাও এসে গ্রামের কাজে যোগ দিল—খেলা আর কাজ মিলে গেল 'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ শুনিসনি কি ভাই'। তিনি জীবন ভর কোন কাজে জোর খাটাতে চাননি। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল 'আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো গান দিযে দ্বার খোলাব'।

সমবেত সঙ্গীত বা সম্মেলন গানের ব্যাপারে তাঁর অবদান অসামান্য। শান্তিনিকেতন আশ্রম যেখানে তিনি গোষ্ঠী জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার জন্যে তিনি রচনা করলেন 'আমার শান্তিনিকেতন' গানটি। তাইতো শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীরা বা যারা সেখানে পড়াশুনা করেছেন তারা শান্তিনিকেতন থেকে দূরে গেলেও সেই গান গেয়ে বলতে পারেন—

'আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার
বাঁধা যে তার সুরে।'

যারা বেসুরো, যাদের কণ্ঠে সুর নেই, তাদেরকেও তিনি 'আমরা না গান গাওয়ার দলে রে, আমরা না গলা সাধার' গান বেঁধে গান গাইয়ে ছেড়েছেন। তাঁর সুর সভায় কেউ অবাঞ্ছিত বা অপাংক্তেয় ছিল না।

আমরা যদি রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে মনের এমন কোন অনুভূতি নেই যা তাঁর গানে স্থান পায়নি। তাইতো আজ হর্ষ বিষাদ ও মনের সব অবস্থাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত

আমাদের নিত্য ও প্রিয় সঙ্গীত। কেউ যদি ইচ্ছে করেন কথা না বলে শুধু গান গেয়েই তার মনের ভাব ব্যক্ত করবেন বোধহয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাহায্য নিয়ে তিনি তার সে ইচ্ছা অনেকাংশে পূরণ করতে পারবেন। সেই বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীত সংকলন পুস্তক 'গীতবিতান'কে মনের অভিধান বললে বোধহয় খুব একটা অত্যুক্তি করা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে সবচাইতে প্রিয় ছিল বোধহয় তাঁর গান। তিনি বলেছিলেন 'সে গানে মোর বহুক স্মৃতি আর যা আছে হউক অবসান'। গভীর মমতার সঙ্গে তিনি যে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন বাঙ্গালীর চিত্তে তা স্থায়ী আসন পাবে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাইতো তিনি গভীর যত্নে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন "জীবনের আশি বছর পর্যন্ত চাষ করেছি অনেক। তবে সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারিনে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকা থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না। যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙ্গালীর শোকে দুঃখে সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।"

কবিগুরুর এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের বাঙ্গালীর জীবনে এমন ভাবে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছে যে তাকে স্বচ্ছন্দে আজ আমাদের বাঙ্গালীদের 'জীবন সঙ্গীত' বলা চলে।

সৃষ্টি তখনই হয় সুন্দর ও চিরন্তন যখন সেটি জীবন ধর্মেরই অনুগমন করে ও সেই বিচারে রবীন্দ্রসঙ্গীত আজ তত সার্থক ও তার আবেদনও তত দুর্বার।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে উৎসর্গীকৃত জীবন ॥

বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আজ আমাদের সামাজিক জীবনে, উৎসব অনুষ্ঠানে, শোকে দুঃখে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এক অপরিহার্য অঙ্গ। এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা হচ্ছে ও বাঙালী মেয়েদের পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত এক অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ বোধহয় কল্পনাও করতে পারবেন না যে আজ থেকে ৪০।৪৫ বৎসর আগে শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চার অবস্থাটা কেমন ছিল। তখন ২।৪টি ব্রাহ্ম পরিবারের ছেলেমেয়েরা ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-প্রাপ্ত কিছু ছাত্রছাত্রী ছাড়া আর কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতেন না ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা করতেন না। তখন যে লোকটি তাঁর একক চেষ্টায় শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনমানসে তুলে ধরে তাকে জনপ্রিয় করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন অনাদিকুমার দস্তিদার, যাঁকে আমরা একপ্রকার ভুলতে বসেছি। তাঁর কর্মবহুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ সালে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার জন্য সে-যুগে তিনি যে সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ করেছিলেন, তার বোধহয় কোন তুলনা মেলে না ও তাঁর সেই একক সংগ্রামের ইতিহাস আজকের দিনে অনেকের কাছে অভাবনীয় ও অকল্পনীয় বলে মনে হবে।

সেটা সম্ভবত ১৯২৫ সাল। শান্তিনিকেতন থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ও সঙ্গীতে বিশেষ শিক্ষালাভ করে অনাদিকুমার দস্তিদার কলকাতায় এলেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছেন কবির গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের নিকট, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম পেয়েছেন পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীর নিকট,

বীণাবাদনের শিক্ষালাভ করেছেন দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত বীণাবাদক পণ্ডিত মঙ্গলেশ্বর শাস্ত্রীর নিকট। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে কবিগুরু ও অন্যান্য সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি কলকাতায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে যে তাঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারে ব্রতী হতে হবে। অবশ্য তখনকার যুগে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পেশা অবলম্বন করে দিন গুজরান করা যে কি প্রকার দুঃসাধ্য ছিল কবি তা জানতেন। তাই, যাতে তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে গিয়ে তাঁর স্নেহধন্য ও আদর্শনিষ্ঠ এই যুবকটিকে আর্থিক দুরবস্থায় না পড়তে হয় সেজন্য রবীন্দ্রনাথ সচেষ্ট হলেন। তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অনাদিবাবুর থাকার প্রস্তাব করলেন ও কলকাতায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিম্নোক্ত চিঠিখানা লিখলেন যাতে তিনি অনাদিবাবুকে কর্পোরেশনের কোন স্কুলে শিক্ষকতার ব্যবস্থা করে দেন।

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সুর

অনাদি কর্পোরেশনের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করতে চায়। ইংরেজী, বাংলা এবং সঙ্গীত তিনটে বিষয়েই ভার নিতে পারে। সঙ্গীতটা এইসব বিদ্যালয়ে চালানো আমি ত' উচিত মনে করি। ক্ষিতীশের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে যদি একটা গতি করা সম্ভব হয় তাহলে সব দিকেই ভালো হয়।

ইতি

রবিকাকা

শুধু তাই নয়, অনাদিবাবু যাতে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে সঙ্গীত শিক্ষকের কাজ পান সেজন্যে কবি অনাদিবাবুকে একখানা সার্টিফিকেট দিলেন। অনুরূপ সার্টিফিকেট তিনি পরবর্তীকালে অন্য কাউকে দিয়েছেন বলে আমরা জানিনে।

সার্টিফিকেটখানা হল নিম্নরূপ—

Viswa-Bharati

Santiniketan, India

শ্রীমান অনাদিকুমার দস্তিদার দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছাত্র ভাবে থাকিয়া গান শিক্ষা করিয়াছেন। আমার রচিত বহুসংখ্যক বাংলা গান ইঁহার জানা আছে। এই গানগুলি যাঁহারা শিখিতে ইচ্ছা করেন ইঁহার সহায়তায় সফলতা লাভ করিতে পারিবেন। ইঁহার চরিত্রের নির্মলতা সম্বন্ধে সংশয় মাত্র নাই।

২৯ আষাঢ় ১৩৩২

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু যেহেতু তাঁর সঙ্গে তাঁর পরিবারস্থ লোকেরাও ছিলেন, সেজন্য অনাদিবাবু কবির প্রস্তাব মত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে না থেকে ১২।১ নং সুকিয়া স্ট্রীটে সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই পেশা অবলম্বন করে জীবনযাত্রা শুরু করলেন। 'তার আগে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই পেশা অবলম্বন করে জীবনযাত্রা শুরু করতে আর কেউ সাহস পেয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

আগেই বলা হয়েছে যে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া কলকাতায় সেই সময় অন্য কোথাও বড় একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা হত না। অনাদিবাবু রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের সাহায্য নিয়ে সেই সব পরিবারেই গান শেখাতে শুরু করলেন ও শত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গুরুদেব তাঁকে যে কাজের ভার দিয়েছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হলেন না। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের মানুষ চিনবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ও অনাদিবাবুকে চিনতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। এই আদর্শনিষ্ঠ ও অসাধারণ প্রতিভাবান যুবকটি যে তাঁর গান প্রচারের উৎকৃষ্টতম বাহন হবে তা ঠিকই বুঝেছিলেন। সেই সময়কার কিছুকাল আগে লণ্ডন থেকে

অনাদিবাবুকে লেখা একখানা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি যা থেকে বোঝা যাবে অনাদিবাবুর উপর কবির কতখানি আস্থা ও প্রত্যাশা ছিল। তাছাড়া এই চিঠিখানাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত সম্বলিত একটি মূল্যবান দলিলও বলা যেতে পারে ঃ—

কল্যাণীয়েষু

অনাদি,

তোমার চিঠিতে বিশ্বভারতীর সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেম। বীণকর ওখানে যদি না থাকেন তবে তুমি গোঁসাইজির কাছ থেকে সুরবাহার অভ্যাস করো—এবং বিশেষ যত্ন করে স্বরলিপি শিখো। স্বরলিপি এমন শেখা চাই যাতে দেখে দেখে বই পড়ার মত গান গাইতে পার—এদেশে অনেকেই তা পারে, সুতরাং এ কেবল অভ্যাস সাপেক্ষ। আর একটি কাজ কোরো—দিনুর কাছ থেকে ইংরেজী সঙ্গীতের স্টাফ নোটেশনও শিখে নিও। এই নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্য ঐ নোটেশনের দরকার হবে! অনতিদূর ভবিষ্যতে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে পারদর্শী কোনো য়ুরোপীয় ওস্তাদকে আমাদের বিশ্বভারতীর জন্য সংগ্রহ করব এ আমার মনে আছে। ইতিমধ্যে তুমি আমাদের প্রাচ্য সঙ্গীত যথাসম্ভব অভ্যাস ও আয়ত্ত করে নিয়ো। ভবিষ্যতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও তোমাকে প্রবেশলাভ করতে হবে—তারপরে তুমি আমাদের বিশ্বভারতীতে একদা সঙ্গীতাচার্য হবে এই আমার মনে আছে। স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তাহলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিক সঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে, সেই একটি মস্ত বড় কাজ আমাদের সামনে রয়েচে, এই কাজের ভার তুমি নেবে বলে সংকল্প কর। যদি এ কথা তোমার মনে লাগে তাহলে ইতিমধ্যে বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে তোমাকে সুরের কাজ দোরস্ত করে নিতে হবে যাতে অতি সূক্ষ্ম সুরও তুমি শোনামাত্র ধরে নিতে পার। আমাদের দেশে সঙ্গীতব্যবসায়ীরা সঙ্গীতের মজুরি করে মাত্র,

তোমাকে সঙ্গীত বিদ্যার আচার্য হতে হবে—সেরকম কোনো লোকই আজ ভারতবর্ষে নেই। আগামী বৎসর আমি যখন আশ্রমে ফিরব তখন যেন দেখতে পাই তুমি অনেকদূর এগিয়ে গেছ। কণ্ঠসঙ্গীতে তুমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পণ্ডিতজি এবং গোঁসাইজি উভয়ের কাছ থেকেই অভ্যাস কোরো—কেননা উভয়ের মধ্যে সঙ্গীতরীতির হয়ত কিছু পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য তোমার জানা চাই। পণ্ডিতজিকে আমার সাদর নমস্কার সম্ভাষণ জানিয়ো এবং তুমি এবং ছাত্রেরা আমার অন্তরের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

ইতি

৩০শে আগস্ট শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাক, অনাদিবাবুর নিষ্ঠা ও চেষ্টায় রবীন্দ্রসঙ্গীত ধীরে ধীরে কলকাতায় প্রসার লাভ করতে লাগল ও কালক্রমে কলকাতার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত এক অপরিহার্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল এবং এর প্রধান প্রবক্তা হলেন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার।

প্রতিষ্ঠিত হল সঙ্গীত সম্মিলনী, যাকে কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রথম সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে ও তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাবার ভার পড়ল অনাদিবাবুর ওপর।

গ্রামোফোন রেকর্ডের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার শুরু হয় তাঁরই উদ্যোগে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামোফোন কোম্পানির কর্ণধার শ্রীহেম সোম তাঁকে সাদরে আহ্বান করে নিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রবীন্দ্রসঙ্গীতের ট্রেণার হিসাবে। সেখানে তাঁর পরিচয় ও হৃদ্যতা ঘটল কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসীমউদ্দিন ও গায়ক ধীরেন দাসের সঙ্গে। অনাদিবাবুর তত্ত্বাবধানে সে যুগের প্রখ্যাত শিল্পীরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করতে শুরু করলেন এবং তা ব্যাপক সমাদর লাভ করল। কিছুদিন আগে বিগত যুগের বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা শ্রীযুক্তা কণক বিশ্বাস (দাস)-এর সঙ্গে এই

বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি জানালেন যে সে-যুগে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যা কিছু রেকর্ড হত তার বেশীর ভাগই হত অনাদিবাবুর নির্দেশনায় ও তাঁর নিজের মোট ৮০ খানা রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ডের অধিকাংশেরই ট্রেণার ছিলেন অনাদিবাবু। নাটকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপস্থাপনা হল তাঁরই প্রচেষ্টায়। নাট্যাচার্য শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী অনাদিবাবুর বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ কবিগুরুর গীতিবহুল নাটক 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'র সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব তিনি দিলেন অনাদিবাবুর ওপর। অনাদিবাবুও সেই দায়িত্ব নাট্যাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ও নাটকের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের আগ্রহে একপ্রকার বিনা পারিশ্রমিকেই পালন করেন। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর এই হৃদ্যতা ও প্রীতির সম্পর্ক নাট্যাচার্য যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন বজায় ছিল।

পরবর্তীকালে তিনি স্টার থিয়েটারে 'তাপসী' ও 'একক দশক' নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

বেতার প্রতিষ্ঠানের তখন শৈশবাবস্থা। সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রচারের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেখান থেকেও রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচারের জন্য আহ্বান এল অনাদিবাবুর কাছে। তিনি বহু রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। বেতারে প্রচারিত নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্লক বা সম্মিলিত অনুষ্ঠান আজকাল খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এটা সম্ভবত অনেকেরই জানা নেই যে আকাশ-বাণীতে অনাদিবাবুই এর প্রথম সূত্রপাত করেন।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারেও অনাদিবাবুব অবদান কম নয়। ১৯৩৮ সালে শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স এর 'মুক্তি' ছবিতে চলচ্চিত্রে প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সফল প্রয়োগ হল, ও তা অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করল। তখন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল অনাদিবাবুকে নিউ থিয়েটার্স-এ আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন।

অনাদিবাবু সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ট্রেণার নিযুক্ত হলেন ও সেই সময়েই তাঁর কাছ থেকে কাননদেবী সায়গল এঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন।

কিছুকাল পর তিনি বম্বে টকীজে যোগদান করেন ও কবিগুরুর 'নৌকাডুবি' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। পরে তিনি নীতিশ বোস পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করেন। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর নিকট রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ ছাড়া বীণকর হিসেবেও কলকাতায় অনাদিবাবুর বিশেষ পরিচিতি ছিল। নৃত্যবিদ্ উদয়শঙ্কর কলকাতা এলে তাঁর দলে তিনি বীণকর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে দলবল নিয়ে উদয়শঙ্কর যখন য়ুরোপ পরিভ্রমণে যান তখন তাঁর সঙ্গে অনাদিবাবুরও যাবার কথা ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর জন্যে তাঁর পক্ষে আর যাওয়া সম্ভব হল না। তখনকার যুগে কলকাতায় কোন উৎসব অনুষ্ঠান বা সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশনের প্রয়োজন হলে ডাক পড়ত অনাদিবাবুর। সেজন্যে ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সঙ্গীত পরিবেশনের ভারও পড়ল অনাদিবাবুর উপরই। এখানে সেই সময়কার একটি কৌতুকপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন যে ঘরে বসেছে তার পাশের একটি ঘরে অনাদিবাবুর নেতৃত্বে গানের জোর মহড়া চলছে। মহড়ার সঙ্গীতের রেশ ভেসে এসে পাশের ঘরে আলোচনারত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উন্মনা করে তুলছে। এই অবস্থা দেখে মহাত্মাজী মন্তব্য করলেন, "পাশের ঘরে যখন এত সুমধুর সঙ্গীত বয়ে চলেছে তখন আমরা কি বেরসিকের মত নিজেদের এই শুষ্ক আলোচনায় আবদ্ধ রাখব? ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বন্ধ রেখে চলুন আমরাও এই সঙ্গীতের স্বাদ উপভোগ করি।" তাঁর

কথানুসারে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখা হল ও সদস্যরা পাশের ঘরে গিয়ে গান শুনতে লাগলেন।

কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ও প্রচার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদান করার জন্যে কোন ভালো প্রতিষ্ঠান তখনো গড়ে ওঠেনি। এই অভাব মোচন হল অনাদিবাবুরই নেতৃত্বে। শ্রীশুভ গুহঠাকুরতা ও ৺সুজিতরঞ্জন রায় প্রমুখ ২/৩ জন রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীর প্রচেষ্টায় ও অনাদিবাবুর নেতৃত্বে স্থাপিত হল ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন 'গীতবিতান'।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণ ও প্রচারে স্বরলিপির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বরলিপির ব্যাপারেও তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপিকার। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে উদ্ভুত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির নানা সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৮ সালে গঠিত স্বরলিপি সমিতির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন তিনিই। ১৯৪৯ সালে কলকাতায় বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগে স্বরলিপি সমিতির সম্পাদক হিসাবে তিনি যোগদান করেন ও ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত স্বরলিপির সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে গেছেন।

সুতরাং অনাদিবাবুর এই কর্মবহুল জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে শান্তিনিকেতনের বাইরে কলকাতায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের যা কিছু প্রসারলাভ ঘটেছে তার আদিতে হলেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

তিনি ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে, বেতার, নাটক, সিনেমা, রেকর্ড নানা অনুষ্ঠান ও স্বরলিপির মাধ্যমে ও কলকাতায় প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে আজকাল বহুজনের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটেছে একদিন ঐ একটি লোক তাঁর একার চেষ্টায় তা করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে জনপ্রিয়তা তার ভিত্তি স্থাপন করেছেন

বলতে গেলে তিনিই।

লোকের মুখে শোনা রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচারে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠার ২/১টি নমুনা এখানে তুলে ধরছি।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বের হলে অনেক সময় তিনি নাকি নিজে তা নিয়ে ঘরে ঘরে বিক্রীর চেষ্টা করতেন। আবার একথাও শোনা যায় যে পথ চলতে চলতে যদি কোন বাড়িতে ভুল সুরে গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনতে পেতেন তো অপরিচিত হলেও সেই বাড়িতে ঢুকে তিনি গানের সুরটি ঠিক করে দিতে চেষ্টা করতেন। বর্তমান যুগে এমনি নিষ্ঠা ও আগ্রহ অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে—আবার কারও কাছে হাস্যকর মনে হওয়াও বিচিত্র নয়।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কাছে শুনেছি যে তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাতেখড়ি হয় বলতে গেলে অনাদিবাবুর কাছেই। শান্তিনিকেতনে যোগদান করার পূর্বে যখনই তাঁর কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার বা জানার প্রয়োজন হয়েছে তখনই তিনি অনাদিবাবুর সাহায্য নিয়েছেন। অনাদিবাবুর কাছে শেখা তাঁর প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত হল, 'যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ'। এই কথা তিনি আজও গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে অনাদিবাবু খুব একটা বেশী কিছু লেখেন নি। তিনি তাঁর মতামত চিরকাল মুখেই ব্যক্ত করে এসেছেন। তবুও তাঁর যে ২/১টি লেখা বের হয়েছে তা থেকে এই বিষয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট ভাবে আঁচ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত কি ভাবে গাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আজকাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার খুবই বেড়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার সূক্ষ্ম সুর এবং ঢং এর বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে মনে হয় না। সা রে গা মা ঠিক রেখে গান গাইলেই তো সব সময় গান হয় না।

সেটার স্বর গাওয়া হয়। কিন্তু স্বর গাওয়া ও গান গাওয়া এক জিনিষ নয়। বরং দরদ দিয়ে ঢংটি বজায় রেখে গাইলে সা রে গা মা একটি ইতর বিশেষ হলেও হয়তো কিছু আসে যায় না। যতদূর সম্ভব পরম্পরালব্ধ গায়কী স্মরণ রেখে স্বরলিপিকে অনুসরণ করাই উচিত।" (গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ৬৭)

ধ্রুপদ খেয়াল ও টপ্পা জাতীয় গানের ভিত্তিতে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাট, তুন, তাল—এইসব প্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন "আমি ব্যক্তিগত ভাবে এর কোনো প্রয়োজন দেখি না। তেমন শিক্ষা বা যোগ্যতাই কজনের আছে। ব্যর্থ প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথের গানকে বিপথগামী, অশ্রাব্য বা অশ্রদ্ধেয় করে কোনো লাভই নেই। দরকার হলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তান, বাট যোগ করে দিতে পারতেন। কোনো কোনো গানের অংশবিশেষ তিনি সেরূপ করেছেনও। সুতরাং আমার অনুরোধ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে কেউ শোধরাবার বা ইমপ্রুভ করবার চেষ্টা না করেন।"

(গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ৬৮)

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা ও প্রচার কি ধারায় হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রসঙ্গীত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর নতুন গান গাওয়া যাবে না। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত কে কত ভালো ভাবে ও বিশুদ্ধ ভাবে এই গানগুলি গাইতে পারি।" (গীতবিতান শতবার্ষিকী পৃঃ ৬৮)

ব্যক্তিগত জীবনে অনাদিবাবু ছিলেন নিরহঙ্কার, আত্মপ্রচারবিমুখ, সত্যনিষ্ঠ, মিষ্টভাষী ও সর্বোপরি কৌতুকপ্রিয়। গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন অনাদিবাবুর কৌতুকপ্রিয়তার কোন সীমা ছিল না। গান শিখবার জন্য যখনই তাঁর কাছে গেছি তখনই দেখেছি যে তাঁর এই কৌতুকপ্রিয়তা যে বিশেষ কোন উপলক্ষে প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশেও তা সমভাবে প্রবাহিত। তাঁর অত্যন্ত নির্মল হাস্য পরিহাসের একটি নমুনা এখানে উল্লেখ না করে

পারছি না।

সুরঙ্গমা সঙ্গীতায়তন থেকে তাঁকে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—সেখানে তাঁর কিছু বলবার কথা। সবাই জানেন যে অনাদিদা এমনিতে ঘরোয়া পরিবেশে অত্যন্ত মজলিশি লোক হলেও কোনদিনই বক্তা নন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে আমাকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, 'কি মাণিক! এখানে দাঁড়িয়ে কেন? শিগ্‌গীর গিয়ে ভিতরে বোস। আমার বক্তৃতা তো! শেষে ভীড়ের জন্যে জায়গা পাবে না।'

শুনেছি দারুণ রোগাক্রান্ত হয়ে যখন তিনি পি জি হাসপাতালে রোগশয্যায় শায়িত, তখনও তাঁর এই কৌতুকপ্রিয়তার বিরাম ঘটেনি। তখনও তিনি নাকি ডাক্তার ও নার্সদের হাস্যপরিহাসে মাতিয়ে রাখতেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তাঁর এই অফুরন্ত রঙ্গপ্রিয়তা দেখে নাকি ডাক্তার ও নার্সরা মন্তব্য করেছিলেন যে এর আগে তাঁরা কোনদিন এত সহৃদয় প্রাণোচ্ছল রসিক পেশেণ্ট দেখেননি।

অনাদিদা তাঁর কর্মবহুল জীবনে বহু অর্থ ও যশ পেয়েছেন। অগণিত ছাত্রছাত্রীর ভক্তি ও প্রীতি ছাড়াও তিনি সম্বর্ধনা লাভ করেছেন কংগ্রেস, রবীন্দ্রমেলা, বাসন্তী বিদ্যাবীথি, সুরঙ্গমা, ইন্দিরা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু যশ বা অর্থের প্রতি তাঁর কোনদিনই আসক্তি ছিল না। তাই বলে তিনি তাঁর আশ্রিত পরিবারস্থ লোকেদের আর্থিক প্রয়োজন বা সাচ্ছন্দ্যের দিকে কোনদিনই উদাসীন ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার সময় বৌদি (অনাদিদার স্ত্রী) আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'জীবনে বহু বাধা বিপত্তি ও দুর্যোগ এসেছে, কিন্তু কোনদিন তাঁকে মুখ কালো করতে বা বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি সব সময়েই বলতেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' আর সত্যিই তিনি তাঁর পরিবারের কারো কোন অভাব রাখেননি। সংসারের সব ঝড় ঝাপ্‌টা নিজের ওপর টেনে নিয়েছেন।

একদিকে গুরুদেবের আদেশে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রচারে অবিচলিত নিষ্ঠা—আর অন্যদিকে সংসারে আশ্রিত প্রত্যেকটি লোকের প্রতি কর্তব্য পালন—এ হল একটি অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠ জীবন, যার তুলনা মেলা ভার।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর কাছে উপাস্য দেবতার মতো। সুস্থ থাকা কালে সকালে নিজেই একটি মালা পরিয়ে দিতেন নিজের ঘরে রাখা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে, ও যখনই বাইরে বেরোতেন রবীন্দ্র-নাথের ছবিকে প্রণাম করে তবে বেরোতেন। বস্তুত, অনাদিদার সমস্ত জীবনটাই ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র সংস্কৃতির রসে পুষ্ট। রোগাক্রান্ত হয়ে যখন তাঁর স্মৃতিশক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকল তখনও তাঁর মন শান্তিনিকেতন, জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথেই মগ্ন ছিল।

১৭নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে স্ত্রীকে বলতেন, 'তাড়াতাড়ি কর, দিনদা রিহার্সাল শুরু করে দিয়েছেন, গুরুদেব এসে পড়েছেন। এটা তো ঠাকুরবাড়ি, আবার ফিরতে হবে শান্তিনিকেতনে।'

অনাদিদা যে অমরধামে প্রয়াণ করেছেন, সেখানে হয়তো এখন নিত্য সুরসভা বসে। হয়তো বসেন দিনেন্দ্রনাথ তাঁর এস্রাজটি নিয়ে, তাঁর পদপ্রান্তে বসেন তাঁর প্রিয় শিষ্য অনাদিকুমার ও পাশে বসে পান সাজেন পরম স্নেহময়ী কমল বৌঠান। গান করতে করতে তাঁরা হয়তো উৎসুক নয়নে অপেক্ষা করেন কখন সেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হবে।

নজরুলের গান

নজরুলের গান আমাদের এক পরম সম্পদ। এর সংখ্যাও বিপুল; যদিও নজরুলের সমস্ত গানকে একত্রে ধরে রাখার কোন ব্যবস্থা না থাকায় এর সংখ্যা যে কত হবে তা বলা মুশ্‌কিল। তবে, অনেকের মতে এই সংখ্যা চার হাজারের কাছাকাছি দাঁড়াবে।

বাংলাদেশে প্রচলিত প্রায় সবরকম গীতরীতির উপর ভিত্তি করেই নজরুল তাঁর গান রচনা করে গেছেন। এদের মধ্যে রাগভিত্তিক গান থেকে ছাদ-পেটার গান পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর রচিত গানের এক বিপুল অংশই রচিত হয়েছে রাগকে আশ্রয় করে ও মার্গ সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে। সে জন্যে প্রথমেই এই জাতীয় গান সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে নিতে চাই।

তাঁর রচিত রাগাশ্রয়ী গানের মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ খেয়াল-ধর্মী, ঠুংরী ও গজল অঙ্গের গান। তিনি যে শুধু প্রচলিত রাগসমূহের উপরই গান রচনা করেছেন তা নয়, তিনি বহু কূট ও অপ্রচলিত রাগের উপরও গান বেঁধেছেন। এই সব কূট রাগের মধ্যে রয়েছে বসন্ত মুখারী, মধুমাধবী সারং, চাদনী কেদার, সাওন কল্যাণ, মিশ্রনারায়ণী, লচ্ছাশাখ, মাণ্ড, নীলাম্বরী, বড় হংস সারং ইত্যাদি।

তিনি বেশ কয়েকটি নূতন রাগের সৃষ্টি করেন ও এদের নামকরণে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও গভীর সাঙ্গীতিক অনুভূতির পরিচয় মেলে। তাঁর সৃষ্ট এইসব নূতন রাগের নাম হল যথাক্রমে রেণুকা, দোলন-চাঁপা, নির্ঝরিণী, যোগিনী, বনকুন্তলা, মধুমালতী, মীনাক্ষী, উদাসী ভৈরব, দেবযানী ইত্যাদি। এইগুলোর সৃষ্টি সম্বন্ধে নজরুল বলেছেন "এগুলো আমার স্বপ্নে পাওয়া রাগ।" 'নবরাগ' স্বরলিপি বইয়ের ভূমিকায় এই সব রাগ সম্বন্ধে শ্রীজগৎ ঘটক লিখেছেন, "মার্গ সঙ্গীত

রচনা কালে তাঁর একনিষ্ঠ মন আহার নিদ্রা ভুলে এমনি বিভোর হয়ে থাকতো যে নিদ্রাকালেও তিনি ওরই স্বপ্ন দেখতেন। সেই সময়ে তিনি অবচেতন মনে, এই সব নতুন রাগের যে আভাস পেতেন, তাকেই অবলম্বন করে তাঁর ঐ সব গান রচনা।"

তাঁর রচিত রাগ-ভিত্তিক গানের মধ্যে গজল গানের ঢং-এ রচিত 'বাগিচায় বুলবুলি তুই', 'আমারে চোখ ইশারায়', 'চেয়ো না স্থনয়না' এই সব গানের জন্যই বোধহয় তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ধ্রুপদকে প্রধান অবলম্বন করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল করেছিলেন খেয়াল গানকে, অতুলপ্রসাদ করেছিলেন চৈতী, কাজরী, ঠুংরী ও কীর্তনাঙ্গ গানকে, আর নজরুল গজল গানকে বাংলা গানে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে বাংলা গানে এক নূতনত্বের স্বাদ নিয়ে এলেন।

নজরুল বহু বিখ্যাত হিন্দুস্থানী গানকে ভেঙে বাংলা গান রচনা করেন। কিন্তু নজরুলের সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হল এই যে তিনি এই সব ভাঙ্গা গানে মূল হিন্দুস্থানী গানকে অনুসরণ করতে গিয়ে কখনই বাঙালীয়ানাকে একেবারে বিসর্জন দেননি। এইখানেই নজরুল রচিত রাগপ্রধান গানের সঙ্গে বর্তমান কালের রাগপ্রধান বাংলা গানের তফাৎ। বর্তমান কালেও রাগপ্রধান গান রচনা হচ্ছে ঠিকই ও ঐ সব গান রাগপ্রধানও হচ্ছে কিন্তু বাংলা গান হচ্ছে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমান কালের কিছু গাইয়ে তাদের দুর্দম কণ্ঠতাড়নায়, রাগাশ্রয়ী নজরুলের ঐ সব গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা নষ্ট করতে বসেছেন।

নজরুল দেশাত্মবোধক গান, পল্লীগীতি, শ্যামাসঙ্গীত—সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচিত দেশাত্মবোধক 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি তো একাই একশো। তাঁর রচিত লোকগীতির মধ্যে 'চোখ গেল', 'পদ্মার ঢেউ রে', 'মেঘলা নিশি ভোরে' এক একটি অনবদ্য সঙ্গীত সৃষ্টি।

. আমার ব্যক্তিগত মত হল এই যে নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতগুলো হল সর্বোৎকৃষ্ট। ভাব, ভাষা ও সুরের ত্রিবেণী সঙ্গমে সৃষ্ট 'বলরে জবা বল', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্ মা', এইসব গানের তুলনা নেই।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে নজরুলের এই অতুলনীয় সঙ্গীত-সৃষ্টিকে সঠিক ভাবে ধরে রাখার ব্যবস্থা আজ অবধি হল না। নজরুলের গান এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে ও তাঁর সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বলে বোঝাই মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে যে কোন্ কোন্ গান আসলে নজরুল রচনা করেছেন।

নজরুলের রচনার মধ্যে এমন অনেক গান আছে যাকে আমরা আদৌ নজরুলগীতি বলে জানিনে ও যা অনেক সময়েই যাঁরা ঐ সব গান রেকর্ড করেছেন, তাঁদের গান বলেই চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে কিছুদিন আগে একটি পুরোনো রেকর্ডের দোকানে টুইন রেকর্ডে 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' গানখানি দেখতে পেলাম। এই গানখানি গেয়েছেন শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ। অনেকেই বোধহয় এখন জানেন যে এটি একটি নজরুলগীতি ও এর কথা ও সুর দুই-ই নজরুলের দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, রেকর্ডের কোথাও নজরুলের নামগন্ধও নেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায় কিন্তু এমনটি হতে পারত না। এইভাবে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদ গোস্বামীর গাওয়া 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর', 'আজি নিঝুম রাতে', 'আমায় বোল না ভুলিতে বোল না', শ্রীমতী দিপালী তালুকদার (নাগ) এর গাওয়া 'মেঘ মেদুর বরষায়', শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের গাওয়া 'পার্থ সারথি বাজাও' ও সিরাজদ্দৌলা নাটকে আলেয়ার গাওয়া বিখ্যাত গান 'পথহারা পাখী' বা সাপুড়ে চলচ্চিত্রে কাননদেবীর গাওয়া 'তোর সাথে তার আড়ি'—গানগুলো যে নজরুলের রচনা তা বোধহয় বলে না দিলে অনেকেই ধরতে পারবেন না।

আবার শোনা যায় যে বাজারে কিছু গান নজরুলের নামে চললেও আসলে তা তাঁর রচনা নয়, ও তাদের মধ্যে নাকি রয়েছে এমন কিছু গান, যার স্রষ্টা হলেন স্বর্গীয় তুলসী লাহিড়ী।

আবার এও জানি যে এমন কিছু নজরুলগীতি আছে যার কথা নজরুলের হলেও সুর অন্যের ও এই সব নজরুলগীতির সুরকারদের মধ্যে শ্রীকমল দাশগুপ্ত ও চিত্ত রায়ের নাম বেশী শোনা যায়। নজরুলের বহুল প্রচলিত 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি' গানখানি নাকি এই পর্যায়ে পড়ে।

এই সমস্ত নানা অসঙ্গতির জন্যে নজরুলের সমগ্র সঙ্গীত সৃষ্টিকে জানা বা তার সঠিক মূল্যায়ন দুরূহ হয়ে উঠেছে।

আমরা সাধারণত দেখি যে এই জাতীয় গান, যার কথা ও সুর দুই-ই একজনের দেওয়া, তাদের একটা স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য থাকে ও সেই স্বকীয়তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বরলিপির মাধ্যমে হয়ে থাকে, যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় হয়ে আসছে। নজরুলগীতির বেলায়ও স্বরলিপি চালু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা তার সঠিক গীতিরূপ রক্ষা করার ব্যাপারে তেমন কার্যকরী হচ্ছে না, কারণ তা হলে নজরুলের একই গানের এত সুরান্তর দেখা যেত না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাঁরা স্বরলিপি করে আসছেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও কবির মুখ থেকে গান শুনে সেটা সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করে রেখেছেন, যদিও হয়তো বা তা পরে স্বরবিতানে প্রকাশিত হয়েছে। সে জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিতে সুর বিস্মৃতি বা সুর বিচ্যুতির সম্ভাবনা কম। কিন্তু নজরুলগীতির যে স্বরলিপি বের হচ্ছে তার স্বরলিপিকার যে সব সময়েই কাজী নজরুলের মুখ থেকে গানটি শুনে বা তার কাছ থেকে গানটি শিখে সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরলিপি করে রেখেছেন তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে

তা দীর্ঘদিন পর স্মৃতি থেকে অনুলিখিত। আবার কিছু গানের স্বরলিপিতে বর্তমানে ২।১ জন শিল্পী যেভাবে সেই গানগুলো গাইছেন তাদেরকেই অনুসরণ করা হয়েছে ও হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নজরুলের একই গানের স্বরলিপি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আলাদা আলাদা ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন ও প্রত্যেকেই নিজের করা স্বরলিপিকে অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। এতে কিছুটা বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতির সৃষ্টি হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সব স্বরলিপি শুধু বিশ্বভারতী সম্পাদিত 'বিশ্ব-ভারতী পত্রিকা' বা স্বরবিতানের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে অনুরূপ অসঙ্গতির সম্ভাবনা কম। ফলে স্বরবিতানে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীত যতটা প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের দ্বারা করা ও আলাদা আলাদা ভাবে প্রকাশিত নজরুলগীতির স্বরলিপিকে সঙ্গত কারণেই জনসাধারণ বা শিল্পীরা অনুরূপ প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে পারছেন না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিগত যুগের অনেক নাম-করা গাইয়ে নজরুলের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় তাঁর বহু গান রেকর্ড করে গেছেন ও একটু চেষ্টা করলেই সেগুলো যোগাড় করা সম্ভব। সেই সব রেকর্ড নজরুলগীতি পরিবেশনের বেলায় দিক্‌দর্শনের কাজ করতে পারে, কারণ তাতে ঐ সব গানের সঠিক গীতিরূপ পাওয়া যায়। আমার মতে বর্তমানে করা নজরুল গানের স্বরলিপির চাইতে ঐ সব রেকর্ডের গীতিরূপ অনেক বেশী প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিল্পীরা বর্তমানে যে সুর ও ঢং-এ গানগুলো গাইছেন তার সঙ্গে নজরুলের নিজের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড করা ঐ সব গানের সুরের ও ঢং-এর অনেক প্রভেদ রয়েছে। এমন কি নজরুলের নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা 'পাষাণের ভাঙ্গালে ঘুম' গানটিতেও সুরের অনেক হেরফের করে শিল্পীদের গাইতে শোনা যাচ্ছে।

অনেকে অবশ্য বলে থাকেন যে নজরুলগীতি তো গায়কীর ওপর-গেয়, সুতরাং তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত অতটা বাঁধাবাঁধি কড়াকড়ির প্রয়োজনটা কি? তর্কের খাতিরে যদি এটা মেনে নেওয়াও যায় যে নজরুলগীতিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত অতটা বাধা নিষেধের প্রয়োজন নেই ও তাতে অতিরিক্ত সুর ও ছন্দের কাজ সংযোজন করবার স্বাধীনতা নজরুল শিল্পীদের দিয়েছিলেন তা হলেও তো এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে অন্যান্য গানের মত নজরুলের গানেও তাঁর প্রদত্ত বাণী ও সুরের সমন্বয়ে গঠিত একটি রূপ বা কাঠামো রয়েছে। শিল্পীরা ইচ্ছে করলে সেই মূল রূপটি অক্ষুণ্ণ রেখে তাতে অতিরিক্ত সুর ও ছন্দের কাজ সংযোজন করতে পারেন। কিন্তু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে নজরুলের গানের এই মূল কাঠামোটিই শিল্পীরা আজ অনেক ক্ষেত্রে বজায় রাখছেন না।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পরিবেশনে শিল্পীদের মুক্ত সুরবিস্তারের যথেষ্ট স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু তার বেলাতেও তো দেখি ওস্তাদের নিকট কোন খেয়াল বা ধ্রুপদের তালিম নিলে তার মূল গঠন বা বন্দেজটিকে অক্ষুন্ন রেখে তবে তাতে অতিরিক্ত সুর ও ছন্দের কাজ সংযোজন করতে হয় তা না হলে গুণী ও সমঝদারদের সমাজে নিন্দে হয়। নজরুলের গানের বেলায় গানের এই মূল কাঠামোটিকে বজায় রাখার এই ন্যূনতম নিয়মটিও কি রক্ষিত হবে না? তা হলে কি আমরা ধরে নোব যে নজরুলগীতি হল এক প্রকারের গান যার কথা নজরুলের হলেও সুরটা সর্বসাধারণের?

কোন গানের গীতিরূপের বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার সুরের ওপর। নজরুলের গানে যদি এই প্রয়োজনীয় ও মূল উপাদান-টির ভেতরই নজরুলকে খুঁজে না পাওয়া যায়, তো ঐসব গানকে নজরুলগীতি বলে প্রচার করার সার্থকতাটা রইল কোথায়?

নজরুলের গানে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে, আমার মতে এই অবস্থার কিছুটা সুরাহা হতে পারে যদি এর প্রতিকারের জন্যে যে

সমস্ত শিল্পী ও সুরকার এককালে নজরুলের সাহচর্য করেছেন, তাঁর কাছ থেকে গান তুলেছেন বা লিখেছেন ও নজরুলের গানের ঢং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে পরিচিত, তাঁদেরকে নিয়ে একটি কমিটি বা বোর্ড গঠন করা হয়।

এই বোর্ড বা কমিটির কাজ হবে :—

(ক) নজরুলের সমস্ত গানকে একত্র করে প্রকাশ করা, যেমন 'গীতবিতানে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় করা হয়েছে। এতে যে সমস্ত গানের কথা ও সুর দুইই নজরুলের, যে সমস্ত গানের কথা নজরুলের কিন্তু সুর অন্যের, যে সমস্ত গানের সুর নজরুলের কথা অন্যের (তেমন কোন গান থাকলে) —তা আলাদা আলাদা ভাবে শ্রেণীভুক্ত করে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া নজরুলের গানের বাণীতেও যদি কোন ভুল বা বিকৃতি অনুপ্রবেশ করে থাকে তো তার সংশোধনের দায়িত্বও হবে এই কমিটি বা বোর্ডের।

আমরা শুনেছি যে, নজরুলকে 'কাজীদা একটা গান লিখে দিন না' বলে খাতা এগিয়ে দিলেই কবি সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুরোধ রক্ষা করতেন ও সেই গানে তখনই সুর বসিয়ে অনুরোধকারীকে তা শিখিয়ে দিতেন। এইভাবে নাকি অনেকের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে নজরুলের কিছু গান জমা ও রক্ষিত হয়ে আছে, যাদের অস্তিত্বের কথা অনেকেরই জানা নেই। যাঁদের কাছে নজরুলের এই সব অপ্রকাশিত গান রয়েছে তাঁদের কিন্তু এগিয়ে এসে 'নজরুলগীত' গ্রন্থকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করার জন্যে সহযোগিতা করতে হবে।

(খ) নজরুলের প্রত্যেকটি গানকে অনুসন্ধান করে তার আসল ও খাঁটি গীতরূপটি জেনে সেই সুরে ও রূপে গানটিকে বেঁধে দিতে হবে ও সেই সব গানের স্বরলিপি খণ্ড খণ্ড আকারে সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে হবে।

নজরুলগীতি আমাদের জাতীয় সম্পদ বলে আমরা আশা করব যে গুণী ও শিল্পীরা এই কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবেন।

সুরসাধক শ্রী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে ছোটবেলায় স্কুলের পথে রেকর্ডে একটি গানের কলি শুনে একদিন থমকে দাঁড়িয়েছিলাম নেত্রকোনা শহরের রেকর্ড বিক্রীর দোকানের সামনে। সেই গানটির প্রথম লাইন হল 'শেষের গানটি ছিল তোমারি লাগি' গানটি শুনে সেই ছেলেবেলাতেই চমকে গিয়েছিলাম, কারণ গানের ভেতর যে এত লালিত্য ও সূক্ষ্ম কাজ দেওয়া সম্ভব তা ঐ গানটি শোনার আগে আমার ধারণা ছিল না। খোঁজ করে জানলাম যে গায়কের নাম হচ্ছে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। তখন থেকেই মনে ইচ্ছা জাগল ঐ অসাধারণ শিল্পীর সামনে বসে তাঁর গলায় গান শুনতে ও সুযোগ পেলে তাঁর কাছে গান শিখতে।

সে সুযোগ মিলল কলকাতায় কলেজে পড়তে আমার কয়েক বছর পর। তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিনটির কথা আমার মনে আজও গভীর ভাবে আঁকা হয়ে আছে।

সেটা বোধহয় ১৯৪৮ কি '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন এক রবিবার হবে। সেই দিনটিতে সকাল বেলায় ৩০ নং সরকার লেনের নীচের ঘরে বসে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ পর উপরের ঘরে যাবার জন্যে ডাক এলো। দোতলায় উঠে দেখলাম একটি ঘরের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যদর্শন ভীষ্মদেব।

ঘরে ঢুকবার মুখে আমাদের প্রত্যেককে তিনি বিনীত ভাবে নমস্কার জানালেন। তারপর দেখলাম শুধু নমস্কারই নয়, প্রত্যেকের জন্যে চা-ও এলো।

দু একটি ছাত্র এলে ভীষ্মদেব গান শুরু করলেন, সুরের ঝংকারে যেন ঘর ভরে উঠল।

গানের শেষে তিনি হেঁটে ট্রামলাইন পর্যন্ত এসে ছাত্র ও

শ্রোতাদের সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। বাড়ি ফিরে এলাম এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে—সেটা কিছুটা সুরের মায়াজালের আর কিছুটা বিনয় ও শিষ্টাচারের অভিজ্ঞতার।

তখন ভীষ্মদেব যে সব গান করতেন ও শেখাতেন তার অধিকাংশই ছিল তাঁর নিজস্ব সৃষ্ট। ঐ সব গান রচনা করার সময়ে দেখা যেত শুধু সুর সৃষ্টিতে নয়, উর্দু ও ব্রজভাষার সাঙ্গীতিক পরিভাষার উপরও তাঁর দখল যথেষ্ট। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করবার ছিল যে ভীষ্মদেব যখনই কোন গান করতেন, সেই গানের বাণীর উচ্চারণ করতেন অত্যন্ত স্পষ্ট ও নির্ভুল ভাবে, যা আজকালকার গাইয়েদের (বিশেষ করে খেয়াল গাইয়েদের) মধ্যে একপ্রকার দেখা যায় না বললেই চলে।

সেই সময়টাতে তাঁর ভেতর যেন একটা সুরের প্লাবন এসেছিল। তখন তিনি বহু খেয়াল, ঠুংরী, গীত ইত্যাদি রচনা করেন ও প্রত্যেকটি গানই এক অনবদ্য সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

কয়েকটি নূতন রাগও তখন তিনি সৃষ্টি করেন, যদিও তিনি তাদের কোন নামকরণ করেননি। এইরূপ তাঁর সৃষ্ট দুটি রাগের উপর দুটি গানের প্রথম লাইন ছিল যথাক্রমে 'চকোরী উড়কর যানা না' ও 'ইনসান এ বরতক্'।

তখন পূরবী প্রেক্ষাগৃহে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছে। রাত জেগে ভারতের শ্রেষ্ঠ গাইয়েদের গান শুনছি। কিন্তু ঐ সব গান শুনেও যখন পরদিন ৩০নং সরকার লেনের দ্বিতলে বসে ভীষ্মদেবের গান শুনছি তখন মনে হয়েছে যেন সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিসের আস্বাদন পাচ্ছি যা ঐ সব শ্রেষ্ঠ কলাকারদের গানের ভেতরও খুঁজে পাইনি।

তাঁর গানের এমনি এক যাদুস্পর্শ ছিল যে এক এক রবিবার এমন হয়েছে যে শ্রোতারা চান খাওয়া ভুলে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩-৩০ অবধি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থেকে তাঁর গান শুনেছেন—কারও

আসন ছেড়ে ওঠবার কথা মনেই পড়েনি।

তাঁর সখ বা বাতিকের মধ্যে দেখেছি সিনেমা দেখা, গুণ্ডি বা জর্দা দিয়ে বেশী পান খাওয়া ও পিক না ফেলা, আর ঘন ঘন চা খাওয়া।

কতগুলো সিনেমা হলে বসে তিনি বেশী ছবি দেখতেন ও সেই হলের কিছু সিট তাঁর বাঁধা ছিল।

অনেকদিন সিনেমা হলে তাঁর পাশে বসে ছবি দেখার সময় শুনতাম গুনগুন করে কোন সুর উৎসারিত হচ্ছে। বুঝতাম নূতন কোন গানের সৃষ্টিকর্ম চলছে। তাঁর ২।১ টি গান রচনার পটভূমিকা এখানে আলোচনা করলে সুরস্রষ্টা ভীষ্মদেবের স্বকীয়তা ও অসাধারণত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইডেন গার্ডেনসে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছেন। খেলা দেখতে দেখতে পাশে বসা দর্শকের কাছ থেকে কাগজ কলম চেয়ে রচনা করলেন 'শাঁওরিয়া তুনে' খাম্বাজ ঠুংরী গানটি।

পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে এসে কাগজ চেয়ে রচনা করলেন 'বহতে যো পাশ' দেশ রাগে খেয়াল গানটি। শুনেছি প্যারাডাইস সিনেমা হলে বসে রচনা করেছিলেন বসন্ত রাগে 'কুদরত কি নিশানি' খেয়াল গানটি।

ভীষ্মদেব এক অত্যাশ্চর্য স্মরণশক্তির অধিকারী। ৩০।৪০ বছরের আগেকার ঘটনারও তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিতে পারেন। এক দিন তাঁর সঙ্গে সিনেমা দেখা নিয়ে আলোচনা করার সময় একটুও না ভেবে তিনি স্বচ্ছন্দে বলে গেলেন যে ২৩।২৪ বছর আগে সোসাইটি ও রক্সি হলে যে দুটি সিটে বসে বেশী ছবি দেখতেন তার নম্বর হল যথাক্রমে এ—২৫ ও সি—৩২।

আমার মনে হয় এই অসাধারণ স্মরণশক্তি তাঁর দ্রুত গান তোলার, গান মনে রাখার ও গানে (বিশেষ করে খেয়াল গানে) স্বরবিন্যাসের একঘেয়েমী থেকে মুক্ত করে তাঁর গানকে এত বৈচিত্রময় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে সাহায্য করেছে।

আর্থিক ব্যাপারে ভীষ্মদেবকে অত্যন্ত নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত দেখেছি। গান শিখে তাঁর কাছে টাকার কথা বলা বা তাঁর হাতে টাকা দেওয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। অবস্থা বা কৌলিন্য তাঁকে কোন ভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। ধনী দরিদ্র সকল ছাত্রকেই দেখেছি সমানভাবে যত্ন করে গান শেখাতেন।

তাঁকে স্তাবকতা বা তোষামোদ কোনদিনই পছন্দ করতে দেখিনি। পরনিন্দা বা পরচর্চাকেও তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দিতেন না। ভীষ্মদেবের কাছে গান শেখার সময়ে এই সব 'বেসুরো' আলোচনার কোন স্থানই ছিল না।

এমনিতে স্বল্পভাষী ভীষ্মদেব উপযুক্ত পরিবেশ পেলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তাঁর সঙ্গীত জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন। এমনি অনুকূল পরিবেশে শুনেছি বেনারসে ভারতবিখ্যাত আলাপিয়া ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেবের সামনে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশন কাহিনী। শুনেছি বিখ্যাত পিলু ঠুংরী 'সইয়াঁ তু একেবারি আ যা' রেকর্ড করে ওস্তাদ বদল খাঁ সাহেবকে শোনাবার সরস বর্ণনা। আরও শুনেছি ছায়াছবি 'রিক্তা' ও 'তটিনীর বিচার'-এর সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু কখনই তিনি এই সব বলার সময়ে নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা করতেন না। অথচ শিল্পী হিসাবে ভীষ্মদেবের জনপ্রিয়তা ছিল চিরকালই অসাধারণ।

ভীষ্মদেবের সঙ্গীত পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য কি যা তাঁকে এতটা স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা দান করেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে তাঁর স্বরক্ষেপনের ঢং, রাগ বিস্তারের মৌলিক পদ্ধতি, সরগম বলার কায়দা, অতি দ্রুত তান করার দক্ষতা, সু-উচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বরের বিস্তৃতি, লয়কারী গানের বাণীর সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও সর্বোপরি খেয়াল গানে সব রকম কাজ গুছিয়ে গানটিকে সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার অসামান্য দক্ষতা।

যাঁরা সাম্প্রতিক কালে তাঁর গান শুনেছেন তাঁরা দেখেছেন এখনও

তিনি কি অসাধারণ দ্রুতলয়ে ও পরিচ্ছন্ন ভাবে তান করতে পারেন। শোনা যায় যে তাঁর এই অতি দ্রুত তান কর্তব শুনে ভারতের এক কীর্তিমান গাইয়ে নাকি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর রাগ বিস্তারের পদ্ধতিটি অভিনব। বিস্তারে এমন সব স্বর সংগতি ইনি প্রয়োগ করেন, যা সম্পূর্ণ মৌলিক ও যা তাঁর মত সৃজনশীল শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁর রাগ বিস্তারে নেই সেই একই স্বর সংগতির পৌনঃপুনিকতা যা অধিকাংশ সময়েই খেয়াল গানের বিস্তার অঙ্গকে একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর করে তোলে।

তাঁর সরগম বলার ঢংটি অদ্ভুত। ছন্দের সঙ্গে স্বরবিন্যাসের সমন্বয়ে তা হয়ে ওঠে এক অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি। অথচ মজা হল এই যে সরগম বলতে গিয়ে তিনি কখনই রাগ রূপকে নষ্ট বা জখম হতে দেননি, যা বর্তমানে অনেক গাইয়েই দ্রুত সরগম বলার কসরৎ দেখাতে গিয়ে করে বসেন।

খেয়াল গান পরিবেশনে তার বিভিন্ন অংশ সুষ্ঠু ভাবে মালার মত গেঁথে গানটিকে সুষ্ঠু পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া তাঁর আর এক অসামান্য কৃতিত্ব। আমার এই কথাটি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হবে যদি কেউ তাঁর রেকর্ড করা কামোদ রাগে 'মতিমালনিয়া' খেয়াল গানটি শোনেন। ঐ অতি অল্প সময়ের মধ্যে খেয়ালের সব রকম কাজ গুছিয়ে গানটিকে এই ভাবে একটা নাটকীয় ও সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার নজীর আমি অন্তত অন্য কোন গাইয়ের রেকর্ড করা কোন খেয়াল গানের মধ্যে আজ অবধি খুঁজে পাইনি।

বর্তমানে অনেক খেয়াল গাইয়ের চিমা ও দ্রুনী গানের মধ্যে লয়ের তফাৎ ছাড়া অন্য কোন তফাৎ নজরে পড়ে না। দুটো গানের সেই একই বিস্তারের পদ্ধতি, সেই একই ছক বাঁধা তান ও সরগম, তফাৎটা হল শুধু লয়ের, অর্থাৎ একটা গান মন্থর গতিতে গাওয়া হচ্ছে, আর একটি গান তার থেকে দ্রুত লয়ে গাওয়া হচ্ছে—শুধু এই-টুকুই। কিন্তু চিমা ও দ্রুনী গানের মধ্যে যে একটা মূলগত প্রভেদ

রয়েছে অর্থাৎ একটি যে রাগ বিস্তার ও অন্যটি যে ছন্দ বিস্তার তা অনেকের গানেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সে জন্যে তাদের গান শুনে মনে যেন কোথায় একটা অভাব ও অতৃপ্তি থেকে যায়। কিন্তু ভীষ্মদেবের খেয়াল সঙ্গীত পরিবেশনে এই অভাব ও অসঙ্গতিটা কোন দিন লক্ষ্য করিনি। তিনি যখন চিমা লয়ে গান করতেন তখন তাতে যেমন রাগ বিস্তার ও সুরের মায়াজালের সৃষ্টি হত, তেমনি যখন দ্রুত খেয়াল ধরতেন তখন তাতে যেন সরগম তান ও বোলতানের মাধ্যমে ছন্দের ফুলঝুরি ফুটতে থাকত। তাঁর গান শুনে মনে হত যেন একটি নিটোল খেয়াল গান শুনছি যাতে কোন অসম্পূর্ণতা নেই।

উপরোক্ত যে বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা বলা হল তা তাঁর গায়ন শৈলীকে এমন এক স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতা দান করেছে যে তাকে সচ্ছন্দে ভীষ্মদেব ঘরানা বা ঢং বলা যেতে পারে।

লঘুচালের গানে অর্থাৎ ঠুংরী গীত গজল ভজন—এই সব গানে ভীষ্মদেবের দক্ষতা অসামান্য। তাঁর অপরূপ কণ্ঠলাবণ্যে ও গলার ত্রি সপ্তকের স্বচ্ছ বিহারে ঐ সব গান হয়ে উঠত এক একটি অনবদ্য সৃষ্টি। খেয়াল গানে হয়তো একটা ধরা বাঁধা ছক আছে ও এর পরিবেশনে তৈরির দিকটাই প্রাধান্য লাভ করে বেশী। কিন্তু লঘু চালের গানে কণ্ঠসঙ্গতি ও সৃজনশীল শক্তির প্রয়োজন বেশী। ভীষ্মদেব তাঁর অসাধারণ কণ্ঠনৈপুণ্যে ও কল্পনাশক্তির পাখায় ভর করে ঐ সব গানকে এমন এক স্তরে পৌঁছে দিতেন যা একমাত্র তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। শোনা যায় যে তাঁর ঠুংরী গান অনেক সময়েই বাইজীদের কণ্ঠে পরিবেশিত ঠুংরী গানকেও ম্লান করে দিয়েছে।

বোধহয় ভীষ্মদেবের এই কলকণ্ঠ ও অবাধ সুরবিহারের ক্ষমতা দেখেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে 'সুর সব্যসাচী' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।

ভীষ্মদেবকে হারমোনিয়াম যন্ত্রের যাদুকর বলা যেতে পারে।

এককালে তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়েই খেয়াল গান করতেন ও হারমোনিয়ামে খেয়ালের সব কাজ মায় তানের কাজ পর্যন্ত তাঁর হাতে সারেঙ্গার মত নিখুঁত ভাবে উঠে আসত। একক হারমোনিয়াম বাদনেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অবশ্য বাংলা তথা ভারতে অনেক পেশাদার হারমোনিয়াম বাদক রয়েছেন ও তাদের হাতও খুব তৈরি। কিন্তু ভীষ্মদেবের বাজনার ঢং ও মান তাদের চেয়ে উন্নততর হবার কারণ তাঁর রাগের ওপর অসামান্য দখল, কল্পনাশক্তি ও বিভিন্ন ও জটিল স্বর সংগতি ও ছন্দ উদ্ভাবনে অসামান্য দক্ষতা।

কিন্তু ভীষ্মদেবের সঙ্গীত প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যতক্ষণ না আমরা তাঁর বাংলা গান নিয়ে আলোচনা করি।

ভীষ্মদেব রেকর্ড করেছেন মোট ৬টি বাংলা গান (এর মধ্যে অবশ্য তাঁর গোড়ার দিককার রেকর্ড করা দুটো গান ধরা হয়নি)। এখনো এক একটি অনন্য সঙ্গীত সৃষ্টি। ভাবতেও অবাক লাগে যে দুর্ধর্ষ খেয়ালিয়া ভীষ্মদেব যখন বাংলা গান গাইলেন তখন তিনি খেয়ালের প্রভাব মুক্ত সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তাঁর বাংলা গান কথা ও সুরের সমন্বয়ে হয়ে দাঁড়াল এক অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে বাণী ও সুরের যে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপের কথা বলেছেন সেটা যেন তাঁর ঐ ক'টি গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ভীষ্মদেবের ঐ ক'টি গান রচিত ও রেকর্ড করা হয়েছে এখন থেকে ৩০ বছরেরও আগে, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তাদের আকর্ষণ এখনও এতটুকুও ম্লান হয়নি।

কিছুদিন আগে বেতারে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'অতীত স্মৃতি'তে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রায়ঃ প্রত্যেক শিল্পী ও সাহিত্যিকই ভীষ্মদেবের ঐ ক'টি বাংলা গানের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন ও তাদের প্রিয় গান বলে বাজিয়ে শুনিয়েছেন।

ভীষ্মদেব একজন অসাধারণ শিল্পী সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি কেমন? এই প্রশ্ন করবার কারণ হল এই যে

অধিকাংশ শিল্পীর বেলায়ই দেখা যায় যে শিল্পী হিসাবে তাঁদের যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও মহান বলে মনে হয়, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে এলে অনেক সময়েই তাঁদের প্রতি সেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ভীষ্মদেব হলেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে দেখেছি যে মানুষ ভীষ্মদেব শিল্পী ভীষ্মদেবের চাইতে কম মহান ও আকর্ষণীয় নন। তাঁর মধ্যে দেখেছি অসাধারণ সহৃদয়তা ও শিষ্টাচার বোধ, আরও দেখেছি তাঁর আত্মপ্রচার বিমুখতা, আর্থিক ব্যাপারে নির্লিপ্ততা, সঙ্গীতে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সমকালীন অন্যান্য গাইয়েদের প্রতি প্রীতি ও সদিচ্ছার ভাব। এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলো, যা বর্তমানে শিল্পীদের মধ্যে এক প্রকার দুর্লভ বললেই চলে, তাঁকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে যে তাঁর সংস্পর্শে এলে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে ভাল না বেসে পারা যায় না। এই সৌম্যদর্শন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পীর পাশে যখনই গিয়ে বসেছি তখনই মনে হয়েছে যেন কোন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গ করছি। ভীষ্মদেবের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক ভাবটা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। কারণ তাঁর এমন এক বংশে জন্ম যাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকের মধ্যেই এই ভাবটা প্রবল ছিল।

এই মহান শিল্পী এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যদিও তাঁর গান আজকাল খুব কমই শোনা যায়। আমরা প্রার্থনা করব এই অসাধারণ মানুষ ও শিল্পী শতায়ু হোন ও বাংলা দেশের নবীন ও উঠতি সঙ্গীত শিল্পীদের তাঁর মত একাধারে শিল্পী ও খাঁটি মানুষ হবার প্রেরণা যোগান।

এক অসাধারণ সঙ্গীত শিল্পীর কাহিনী

ভারতের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের আজ বড় দুর্দিন। এই ধারার সেরা গাইয়ে যথা ওস্তাদ আব্দুল করীম খাঁ সাহেব, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ মুস্তাক হুসেন খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ, বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধন প্রভৃতির তিরোধানে কণ্ঠসঙ্গীত জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের মান নিম্নমুখী। এমন কি সর্বভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন গাইয়েকেই আজ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু কিছুদিন আগেও বাঙালী গাইয়েদের এরূপ দুর্দশা ছিল না। শ্রীরাধিকা গোস্বামী বা শ্রীগিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তীর কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু তাঁদের পরেও এমন সব বাঙালী গাইয়েদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ভারতে বাঙলার মান রেখেছিলেন ও যাঁদের এককালে ভারতের শীর্ষস্থানীয় গাইয়েদের মধ্যেই ধরা হত।

আজ সেই রকম একজন বাঙালী গাইয়ের কথাই বলতে বসেছি—যিনি তাঁর তরুণ বয়সেই তখনকার দুর্ধর্ষ ও প্রবীণ ওস্তাদদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করে বাঙলার বাইরে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন ও যাঁর সেই সব অসাধারণ সঙ্গীত পরিবেশনের কাহিনী এখনো অনেকের মুখেই কিংবদন্তীর ন্যায় ফেরে।

সেই সব কাহিনী শুনে বাঙালী হিসেবে আমাদের বুক গর্বে ভরে ওঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে দুঃখও হয় যে সেই হারানো গৌরব বোধহয় আমরা আর কোনদিনই ফিরে পাব না।

যাক, আলোচ্য প্রবন্ধে সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে এই বাঙালী শিল্পীটির সঙ্গীত পরিবেশনের সেই রকম ক'টি ঘটনার কথাই এখানে বলব যা এককালে ভারতীয় সঙ্গীত মহলে বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের বর্তমান অবস্থায়, তরুণ ও উঠতি বাঙালী গাইয়েদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবার জন্যে এই সব ঘটনা আজ স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ঘটনাগুলো ঘটে ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে বাঙলার বাইরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে। তখন শীতের মরসুমে ২।৩ মাসের জন্যে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন বেনারসে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে তা ফৈজাবাদ, কানপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, মথুরা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটত সিন্ধু প্রদেশের শীকারপুর শহরে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে বেনারসে খুব সম্ভবত ১৯৩৪-৩৫ সালের মধ্যে। তখন সেখানে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হয়েছে ও তাতে যোগদান করতে এসেছেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় গাইয়ে বাজিয়েরা। তখনকার দিনে ঐ সব সঙ্গীত সম্মেলনগুলো আজকাল-কার মতো শুধু একটা সঙ্গীতের জলসাতেই পর্যবসিত হয়নি—তাতে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক দিকটারও আলোচনার ব্যবস্থা থাকত। সেই রকম একটি আলোচনায় পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণরতন জন-করের জৌনপুরী রাগে ধৈবতের শ্রুতি নিয়ে ২ দিন ধরে জোর বিতর্ক চলেছে। সেই বিতর্কের উপসংহারে সঙ্গীতের আসর বসেছে ও তাতে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর সঙ্গীত পরিবেশন করতে বসেছেন। তখনকার দিনে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে গাইয়েদের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেবার কোন ব্যবস্থা থাকত না। গাইয়েরা তাঁদের খোলা ও জোরালো কণ্ঠে সঙ্গীত পরিবেশন করে তা সবার কাছে পৌঁছে দিতেন, ও যিনি তা পারতেন না তিনি শ্রোতাদের

সমালোচনার সম্মুখীন হতেন। পণ্ডিতজী মালকোষ রাগে গান ধরলেন ও চড়া ও জোরালো কণ্ঠে ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে তাঁর পরিবেশন শ্রোতাদের কাছে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠল।

এরপর গাইবার পালা আমাদের প্রবন্ধে আলোচ্য ঐ বাঙালী শিল্পীটির। তখন তাঁর কতই বা বয়স হবে, বড় জোর ২৩ কি ২৪ বছর। গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন সেই শিল্পীটি মঞ্চে উঠে সকলকে অভিবাদন জানালেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সেই যুগে সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে প্রথম সারিতে বসতেন তাঁরাই যাঁরা সত্যিকার জ্ঞানী ও গুণী এবং তাঁরা সম্মেলনের প্রথম থেকে শেষ অবধি উপস্থিত থেকে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান শুনতেন। সেই অনুসারে সম্মেলনের প্রথম সারিতে তখন বসে ওস্তাদ নাসীরুদ্দিন খাঁ সাহেব, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণরতন জনকর, পণ্ডিত কৃষ্ণরাও ভাস্কর, পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র প্রভৃতি ভারতীয় সঙ্গীত জগতের দিকপালেরা। যে কোন নবীন গাইয়েরই ঐ সব দিকপালদের দেখে একটু ঘাবড়ে বা দমে যাওয়ার কথা। কিন্তু অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ঐ শিল্পীটির, তিনি আসরে বসে একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচের পরিচয় না দিয়ে গান ধরলেন মালকোষ রাগে। তবে সে মালকোষ পণ্ডিতজীর গাওয়া মালকোষ থেকে একটু ভিন্ন, কারণ তা ঔভব জাতীয় মালকোষ নয়—তা হল রেখাব ও পঞ্চম যুক্ত সম্পুর্ণ মালকোষ। গান শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেই সতেজ ও মধুর কণ্ঠে সমস্ত সম্মেলন কক্ষ যেন সুরে ভরে উঠল। বিস্তার তান সরগম ও লয়কারী সহযোগে তিনি যখন তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করলেন তখন ঐ তরুণ শিল্পীর অসাধারণ সঙ্গীত নৈপুণ্যে শ্রোতারা বিস্মিত ও মুগ্ধ—সামনের সারিতে বসা ঐ সঙ্গীত মহারথীরা তারিফে সোচ্চার। অনুষ্ঠান অন্তে রাশভারী ও স্বল্পভাষী ভারত বিখ্যাত আলাপিয়া ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ পাশে বসা পণ্ডিত ওঙ্কার

নাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন—'পণ্ডিতজী, আপকা বোলনা বহুত আচ্ছা হুয়া থা, লেকেন গানা তো আজ ইয়ে বাবুজীনে গায়া' (অর্থাৎ পণ্ডিতজী, আপনার বলা খুব ভাল হয়েছিল, কিন্তু গান আজ গেয়েছে এই বাবুটি)।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কানপুর শহরে। তখন সেখানে সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ও তাতেও সমাবেশ ঘটেছে ভারতের সেরা গাইয়ে বাজিয়েদের। সেই বাঙালী শিল্পীটি ততদিনে তাঁর সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্যে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। তাঁর অনুষ্ঠান তখন ভারতের সেরা গাইয়েদের অনুষ্ঠানেরই পাশাপাশি রাখা হচ্ছে ও সম্মেলনগুলোর প্রায় সব অনুষ্ঠানেরই পরিসমাপ্তি ঘটছে তাঁর ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গীত পরিবেশনায়।

সেখানকার সান্ধ্যকালীন আসরে সেই বাঙালী গাইয়েটি গান ধরেছেন খাম্বাবতী রাগে ও সমস্ত শ্রোতা তাঁর গান মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন। ঐ শ্রোতাদের মধ্যে যে অনেক গাইয়ে ও শিল্পীরাও রয়েছেন ও তাঁরাও যে ঐ গানটি জানেন তার প্রমাণ মিলল যখন দেখা গেল গানের অন্তরা ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে অনেকেই গায়কের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তা গেয়ে চলেছেন ও তা সম্মেলন কক্ষে এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনার ও পরিবেশের সৃষ্টি করল।

ঐ শিল্পীটির অনুষ্ঠান শেষ হলে আসরে এসে বসলেন 'আফ-তাব্-এ-মৌসিকী' বা ভারতসূর্য ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। ঐ তরুণ শিল্পীটির গান শ্রোতাদের মনে এত গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল যে তারা ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকেও খাম্বাবতী রাগ গাইতে অনুরোধ করলেন যাতে তাঁর মুখেও এই রাগ শুনে একই রাগের ওপর দুই অসাধারণ শিল্পীর দুই বিভিন্ন ধারার সঙ্গীতের বৈচিত্র্যের স্বাদ তারা অনুভব করতে পারেন। খাঁ সাহেবও শ্রোতাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করে খাম্বাবতী রাগে গান ধরলেন ও তাঁর গানও স্বকীয়তার

যাদুস্পর্শে এক অপরূপ সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াল।

পরদিন সকালের আসরে সেই তরুণ শিল্পীটি গাইলেন দেশী টোড়ী রাগে খেয়াল ও তাঁর সৃষ্ট সুরের মায়াজাল যেন শ্রোতাদের সম্মোহিত করে দিল। তারপর যথারীতি আসরে এসে বসলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। এবারও শ্রোতাদের অনুরোধ—'আপভি দেশী টোড়ী গাইয়ে' (আপনিও দেশী টোড়ী গান)। এবারও খাঁ সাহেব তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে দেশী টোড়ী রাগে গান গেয়ে শ্রোতাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন। শ্রোতৃবৃন্দ দুই অসাধারণ শিল্পীর, তার মধ্যে একজন নবীন ও আর একজন প্রবীণ, দুই বিচিত্র ধারার সঙ্গীতের অবগাহনে তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। সেই সঙ্গীত সম্মেলনে ঐ নবীন শিল্পীটির গান শ্রোতাদের এত অভিভূত করল যে তাদের তরফ থেকে তাঁকে স্বর্ণ পদক দেওয়া হল।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে মথুরায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনে। সেই অনুষ্ঠানেও সেই শিল্পীটির ও ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের পর পর গান গাইবার কথা।

সেখানকার শ্রোতারা খেয়াল গান শুনতে একেবারে নারাজ। খেয়াল গান ধরলেই সঙ্গে সঙ্গে তারা হাততালি দিয়ে গাইয়েদের উঠিয়ে দিচ্ছেন। আসরের অবস্থা দেখে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব প্রস্তাব করলেন যে এখানে তিনি প্রথম গান করতে চান—তারপর ঐ বাঙালী শিল্পীটি গান করুন। অত্যন্ত বিনয়ী ও ভদ্র সেই গাইয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তাতে রাজী হয়ে গেলেন।

খাঁ সাহেব আসরে বসে খেয়াল গান না করে ঠুংরী ও গজল গান ধরলেন ও তাঁর অনুপম গায়ন ভঙ্গী, বিশেষ করে গজলের 'সেরের' কাজ শ্রোতাদের একেবারে মাতিয়ে দিল।

এরপর ঐ শিল্পীটির গাইবার কথা। অবস্থা দেখে তাঁর অভিভাবক-স্থানীয় সঙ্গীরা তাঁকে বললেন—'দেখলে তো আসরের অবস্থা। এখানে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব পর্যন্ত খেয়াল গান করলেন না। তুমি

একটা কাজ কর—এটা তো মথুরা শহর, তুমি বরঞ্চ ভজন গান কর।' কিন্তু সেই তরুণ শিল্পীটি তাতে অসম্মতি জানিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন—'আমি খেয়ালিয়া, আমি খেয়াল গানই করব—তা শ্রোতারা নিক বা না নিক।' এই কথা বলে সেই অকুতোভয় শিল্পীটি বিনা দ্বিধায় আসরে গিয়ে বসলেন ও তাঁকে শুধু অনুচ্চস্বরে তবলচীকে তাঁর গানের তাল সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে শোনা গেল। তারপরই তিনি গান ধরলেন বাহার রাগে জলদ ত্রিতালে 'করসোলে যাইও' গানটি। বিস্তার, তান, সরগম, বাট ও দক্ষ তবলচীর সাথ সঙ্গতে সুরের ও ছন্দের যে মায়াজাল ও বর্ণালীর সৃষ্টি হল তার বোধহয় তুলনা নেই। এবার শ্রোতাদের তরফ থেকে কোন গুঞ্জন বা আপত্তি শোনা গেল না। কারণ খেয়াল গান যে এত মনোহর ও আকর্ষণীয় করে গাওয়া যেতে পারে তা এর আগে তাদের ধারণাতেই ছিল না। ঐ অনুষ্ঠান শেষ হলে সম্মেলন কক্ষ করতালি ধ্বনিতে ফেটে পড়বার যো হল ও তাতে যোগদান করলেন স্বয়ং ফৈয়াজ খাঁ সাহেব।

উপসংহার করছি এমন একটি ঘটনা দিয়ে যা থেকে বোঝা যাবে যে ঐ শিল্পীটির শুধু যে সঙ্গীতেই অসাধারণ নৈপুণ্য ও প্রতিভা ছিল তা নয়, তিনি সত্যিকার গুণীদের মর্যাদা দিতে জানতেন ও প্রয়োজন পড়লে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মত সৎসাহসও তাঁর ছিল।

আগ্রা শহরে সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হয়েছে ও তাতে সঙ্গীত পরিবেশন করতে বসেছেন ভারত বিখ্যাত ধ্রুপদী ও আলাপিয়া ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব। হঠাৎ সেই আসরে শ্রীদিলীপচাঁদ বেদী উঠে দাঁড়িয়ে খাঁ সাহেবকে বলে বসলেন—'খাঁ সাহেব, আপনি তো একজন মস্ত বড় ওস্তাদ, একটু তান করে দেখান দিকি।' তার এই কথায় সেই সঙ্গীত সভায় দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল ও খেয়ালীদের কারও কারও মুখে চাপা উল্লাসের ভাবও হয়তো ফুটে উঠে থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন খেয়ালিয়া ঐ বাঙালী শিল্পীটি।

তিনি শ্রীদিলীপচাঁদ বেদীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'বেদীজি, আপনি ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সাগরেদ ও আপনি একজন উৎকৃষ্ট খেয়ালিয়া ও আপনি খুব ভাল তান করতে পারেন, তাও আমরা জানি। কিন্তু নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব খেয়ালিয়া নন, তিনি একজন ধ্রুবদীয়া ও ধ্রুপদে তান করবার রেওয়াজ নেই। কিন্তু আপনিই বলুন খাঁ সাহেব যে ভাবে কোন পুনরাবৃত্তি না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা রাগে বড়হত্ বা বিস্তার দেখাতে পারেন, সেটা ক'জন খেয়ালিয়া করতে পারবেন?' তাঁর এই দৃপ্ত প্রতিবাদে শ্রীদিলীপচাঁদ বেদী চুপ করে গেলেন ও সেই দিন একজন বর্ষীয়ান ধ্রুপদীয়ার মান রক্ষা করলেন আর একজন নবীন ও তরুণ খেয়ালিয়া।

অনুরূপ ঘটনা ঐ শিল্পীটির জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আত্মপ্রচার বিমুখ সেই শিল্পীটি সে সম্বন্ধে একেবারে নীবব। এই সমস্ত ঘটনাব বিবরণ আমাদেব চিরকালই শুনতে হয়েছে অন্যদের কাছ থেকে।

উপরে যে অসাধারণ শিল্পীটিব কথা এতক্ষণ বলা হল, তিনি আর কেউ নন—তিনি হলেন আমাদের সকলের গর্ব, সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবালে সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যদিও আজকাল তাঁকে খুব কমই সঙ্গীতের আসরে দেখা যায়। তবুও এখনও তিনি যখন কোথাও সঙ্গীত পরিবেশন করতে বসেন তখন তাঁর অনন্য প্রতিভায় তা এক অপরূপ শিল্পসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায় ও তাঁর মুখে 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা' গানটি শুনে তাঁর সেই ফেলে আসা গৌরবময় দিনগুলোর কথা মনে করে অনেক শ্রোতারই চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

(উপরোক্ত ঘটনাগুলোর বিবরণ সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চা হয়ে থাকে ও সম্প্রতি স্কুল কলেজের মাধ্যমে ও নানা কনফারেন্স ও জলসার আনুকুল্যে এর চর্চা ও প্রচার যথেষ্ট বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা ও প্রসারে স্বর্গতঃ ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব, সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও নগেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ, যাঁরা এখনো উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা করে থাকেন বা ছাত্র ছাত্রীদের গান শিখিয়ে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের, বিশেষ করে খেয়াল গানের চর্চা প্রবহমান রেখেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই কোন না কোন সময়ে এই তিনজনের কারও কাছে তালিম পেয়েছিলেন।

এ ছাড়া কলকাতায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে যোগদান করার জন্যে বিভিন্ন সময়ে বহু গুণী ও কলাকার এখানে এসেছেন। তাঁদের গান শোনার ফলে ও তাঁদের স্বল্পকালীন কলকাতায় বাস করার সময়ে তাঁদের কাছে তালিম নিয়েও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা যথেষ্ট উপকৃত হন। বহিরাগত উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ওস্তাদ আব্দুল করীম খাঁ সাহেব, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী কেসর বাঈ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের নাম।

উপরে কণ্ঠসঙ্গীতের যে সব দিকপালদের নাম উল্লেখ করা হল শ্রীমতী কেসর বাঈ (ইনিও এখন অবসর গ্রহণ করেছেন) বাদে অন্যরা সবাই পরলোক গমন করেছেন ও তাঁদের মৃত্যুতে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের জগতে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা

আজও পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের মান নিম্নমুখী ও সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন-গুলোতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন বাঙালী গাইয়েরও আজ অভাব দেখা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের এরূপ দুর্দশা কিন্তু আগে ছিল না। রাধিকা গোস্বামী বা গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কথা বাদ দিলেও তাঁদের পরবর্তী যুগে ৺জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও ৺তারাপদ চক্রবর্তীর মত উচ্চমানের গাইয়েদের আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে বাঙালী শিল্পীদের মান রেখেছিলেন।

যদি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের, বিশেষ করে খেয়াল গানের চর্চা ও ধারার বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে এতে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের প্রভাবই সর্বাধিক।

কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গোলাম আলী খাঁ সাহেব স্বরক্ষেপণ ও স্বর-প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি গলায় তার-যন্ত্রের কাজের ন্যায় সূক্ষ্ম স্বরবিন্যাস, তানে জটিল স্বর সংগতির সাবলীল প্রয়োগ ও সর্বোপরি তিন সপ্তকে সঞ্চরমান উদাত্ত মধুর কণ্ঠের যে নমুনা রেখে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। সঙ্গীত সম্মেলনে পরিমিত সময়ের মধ্যে ও বিভিন্ন রুচির শ্রোতার মনোরঞ্জনের তাগিদে গাওয়া গানে প্রকৃত গোলাম আলী খাঁ সাহেবের সন্ধান পাওয়া যায় না। সত্যিকার রসগ্রাহী শ্রোতার কাছে গোলাম আলী খাঁ সাহেব ছিলেন এক দুর্ধর্ষ খেয়ালিয়া ও তাঁর পিতৃব্য ওস্তাদ কালে খাঁ সাহেবের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এর প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম ১৯৪১/৪২ সালে শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের বাড়িতে মধ্য রাত্রিতে খাঁ সাহেবের মুখে দরবারী কানাড়ার খেয়াল গান শুনে।

ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব খেয়াল গানে এক শান্ত সমাহিত

মেজাজ এনে দিয়েছিলেন। তাঁর আলাপ ও রাগ রূপায়ণ ভাবের গভীরতায় আমাদের মনকে সব রকম চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত করে এনে এক অনির্বচনীয় রসে সিঞ্চিত করে দেয়। তাঁর তান কর্তব ও সরগম বলার ভঙ্গীটিও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমার মতে আমীর খাঁ সাহেব তাঁর শান্ত সমাহিত গানের মাধ্যমে বাঙালী খেয়াল গাইয়েদের এক মহা উপকার করে গেছেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের ব্যর্থ অনুকরণে বা অন্য যে কারণেই হোক সুরের ও শ্রুতির কেরামতি দেখাবার জন্যে খেয়াল গানের বিস্তার অঙ্গে বাঙালী গাইয়েদের গানে সুরে কায়েম না হয়ে যে এক অস্থিরতা ও চঞ্চলতা প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, আমীর খাঁ সাহেবের সঙ্গে সমাহিত গানের মেজাজ সেই প্রবণতা অনেকাংশে দূর করেছে। ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেব ছিলেন এক জাতশিল্পী, যিনি সস্তা বাহবা পাবার জন্যে তাঁর গানকে আপাতমধুর করার চেষ্টা কোনদিন করেন নি। তিনি শুধু খেয়াল গান করতেন ও সেজন্যে শ্রোতাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করলে বা তাদের তরফ থেকে লঘু চালের গানের ফরমায়েস এলে তাঁর সেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে "ম্যায় তালিকা গানা নহি গাতা হুঁ" (অর্থাৎ আমি হাততালি পাবার গান করি না) বলার ছবিটি যেন আজও চোখের ওপর ভাসছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আর্টিস্ট অলুব্ধ। সে স্বাদ গ্রহণের উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য করে ভালো লাগার অমিতাচারকে অশ্রদ্ধা করে"। কবিগুরুর আর্টিস্টের এই সংজ্ঞা যেন আমীর খাঁ সাহেবের মধ্যে মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক শোকাবহ দুর্ঘটনায় তাঁর অকালমৃত্যুতে ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীত জগতের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূরণ হবার নয়।

আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীদের দৈন্য বর্তমানে বিশেষ ভাবে প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে। যন্ত্রসঙ্গীতে কিন্তু অতটা দৈন্য দেখা যায় না। পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ওস্তাদ আলী আকবরকে বাদ দিলেও পশ্চিমবঙ্গে সেতার সরোদ বেহালা ও

তবলায় এমন সব শিল্পী রয়েছেন যাঁদের মান প্রথম শ্রেণীর ও যাঁরা একটু চেষ্টা করলেই সর্বভারতীয় শিল্পী বলে গণ্য হতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হলো যে যন্ত্রসঙ্গীতের তুলনায় কণ্ঠসঙ্গীতের এই দৈন্যটা কেন? এই বিষয়টি চিন্তা করে আপাতদৃষ্টিতে যে দুটি কারণ এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী বলে মনে হয়েছে তা একে একে তুলে দিচ্ছি।

প্রথমতঃ, যন্ত্রসঙ্গীতে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান মাঝপথে থামলে তাদের চলে না, কারণ যন্ত্রসঙ্গীতে কলাকৌশলে অনভিজ্ঞ বা তৈরি কম হলে, শুধু হাত মিষ্টি বলে রেহাই পাওয়া যায় না। যন্ত্রসঙ্গীতের শিল্পীদের বাধ্য হয়ে ধৈর্য ধরে ও পরিশ্রম করে সঙ্গীতের কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয় ও তাদের একটা বিশিষ্ট ধাপে বা মানে পৌঁছতেই হয়। কিন্তু উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীর বেলায় সেই মানে পৌঁছবার পথে অনেক অন্তরায় দেখা দেয়।

মনে করুন মধুর কণ্ঠবিশিষ্ট কোন সঙ্গীত শিল্পী হয়তো খুব উৎসাহের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা শুরু করলেন। কণ্ঠ মাধুর্যের জন্যে তার কিছু অনুরাগী ও ভক্ত জুটে গেল। তাদের তাগাদা ও প্ররোচনায় তিনি হয়তো এখানে সেখানে পাড়ায় জলসায় হালকা ধরণের গান গাইতে শুরু করলেন ও আর কিছু না হোক অন্ততঃ মিষ্টি গলার জন্যে বেশ হাততালি ও বাহবা পেলেন। তিনি দেখলেন যে পরিশ্রম করে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের কলাকৌশল আয়ত্ত না করেও মধুর কণ্ঠের জন্যে গীত, ভজন ও বাংলা গান গেয়েই তাঁর বেশ জনপ্রিয়তা ও অর্থাগম হচ্ছে। এরপর রেডিওতে তিনি হয়তো সুযোগ পেলেন ও ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করার জন্যেও আহ্বান এলো। ব্যস, এইখানেই তার উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীর জীবনের অবসান হয়ে গেল। যশ ও অর্থাগমের সহজ পথটাই তিনি বেছে নিলেন। এইভাবে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা থেকে সরে গিয়ে লঘু ও সহজ সঙ্গীতকেই পেশা হিসেবে বেছে

নেবার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গীত বা যে কোন কলাবিদ্যাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে চাই সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাশক্তি ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে স্বরবোধ। যাদের মেধা, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাশক্তি ও স্বরবোধ রয়েছে তারা যদি ধৈর্য ধরে ও পরিশ্রম করে চেষ্টা করেন তো যন্ত্রসঙ্গীতে সাফল্য লাভ করতে পারেন। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতের বেলায় মেধা, সৌন্দর্যবোধ, কল্পনাশক্তি ও স্বরবোধ ছাড়াও আর একটি জিনিসের প্রয়োজন—সেটি হল সঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠের। যারা কণ্ঠসঙ্গীত চর্চা করে থাকেন ও যারা নিয়মিত গান শুনে থাকেন তারা জানেন যে সঙ্গীতের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠ কতটা দুর্লভ। সঙ্গীতের উপযোগী মধুর কণ্ঠ ভগবানের একটি অমূল্য দান—এটি জন্মলব্ধ—একে চেষ্টা করে বা পরিশ্রম করে লাভ করা যায় না। যারা সুকণ্ঠ তারা হয়তো চেষ্টা করলে তাদের কণ্ঠস্বরকে আরো মার্জিত ও উন্নততর করতে পারেন কিন্তু বেসুরো ও সঙ্গীতের অনুপযোগী কণ্ঠকে চেষ্টা করে সুরেলা করে প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হয়েছেন—এরূপ নজীর বোধহয় সঙ্গীতের ইতিহাসে নেই। তাই সঙ্গীতের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠ দুর্লভ হওয়াতে উঁচু দরের কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হওয়াটা সুলভ বা সহজসাধ্য নয়।

এছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে যা বাঙালী কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীদের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে ও সেগুলো হল যথাক্রমে বাঙালী গাইয়েদের পরিশ্রম বিমুখতা, অনুকরণ প্রবণতা, উপযুক্ত আচার্য বা সঙ্গীত শিক্ষাগুরুর অভাব ও প্রায়োগিক সঙ্গীত চর্চার চেয়ে সঙ্গীত তত্ত্বের বা শাস্ত্রের আলোচনায় অধিকতর গুরুত্ব আরোপ।

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ করে খেয়াল গানে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হলে শুধু মধুর কণ্ঠ বা শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেই চলে না, তাতে সাফল্য লাভ করতে হলে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম বা রিওয়াজ ও

ধৈর্যের প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী খেয়াল গাইয়ে ও শিক্ষার্থী এই পরিশ্রমের কাজটুকু করতে চান না, ফলে তাদের গানে দাপট তৈরির ভাগটা অনেকটা আয়ত্তের বাইরে ও কাঁচা থেকে যায়। সেজন্যে কণ্ঠমাধুর্য, প্রতিভা ও যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সত্বেও খেয়াল গানের পরিবেশনায় অন্যান্য প্রদেশের পরিশ্রমী ও তৈরি গাইয়েদের কাছে বাঙালী গাইয়েদের অনেক সময় হঠে আসতে হয়। শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের দাদা ৺কিষেণচাঁদ বড়ালের (গঙ্গুবাবু) আনুকূল্যে তাঁদের বাড়িতে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের সুরমণ্ডল নিয়ে রেওয়াজ শোনার মত এক দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল ও তার স্মৃতি আমার জীবনে এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছ। তখন উপলব্ধি করেছি কি নিরলস সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে গোলাম আলী খাঁ সাহেবের তাঁর কণ্ঠের অসাধারণ সাবলীলতা ও মাধুর্য আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

আর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাঙালী গাইয়েদের অনুকরণ প্রবণতা তাদের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হবার পথে একটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীই শিক্ষার প্রথম অবস্থায় তাদের গুরু বা শিক্ষকের গায়ন পদ্ধতির অনুকরণ ও অনুসরণ অবশ্যই করবেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হতে গেলে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হবে স্বকীয় ভঙ্গীতেই। বাদল খাঁ সাহেবের কাছে অনেকে তালিম নিয়েছিলেন, ভীষ্মদেবও নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যে ভীষ্মদেবের মর্যাদা ও স্বীকৃতি তা হচ্ছে এই জন্যে যে তিনি সঙ্গীতে যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সেটা হল একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হতে গেলে বাঙালী গাইয়েদের এই অনুকরণ প্রবণতা ত্যাগ করে আত্মপ্রকাশের নিজ নিজ ভঙ্গী খুঁজতে হবে।

উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে উঁচুদরের শিল্পী সৃষ্টি না হওয়ার আর একটি কারণ বোধহয় বর্তমানে উপযুক্ত আচার্য বা

শিক্ষাগুরুর অভাব। এটা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব, সঙ্গীতাচার্য শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী বা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ দত্তের স্তরের সঙ্গীত শিক্ষাগুরু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে নেই।

আর কণ্ঠসঙ্গীতে প্রায়োগিক দিকটার চেয়ে তত্ত্বের দিকে বর্তমানে অধিক জোর বা পারদর্শিতার প্রবণতার কথা বলতে গিয়ে এটা বলা চলে যে সঙ্গীত হল মূলতঃ গুরুমুখী বিদ্যা। তাকে শুধু বই পড়ে বা শাস্ত্রজ্ঞানের মাধ্যমে আয়ত্ব করা যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরুর, যিনি শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নন্, গাইয়ে বা কলাকারও, তাঁর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতেব প্রায়োগিক দিকটা চর্চা করার। পশ্চিমবঙ্গে আজকাল সঙ্গীত শিক্ষাটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্কুল কলেজের মাধ্যমে হচ্ছে বলে সঙ্গীতের প্রায়োগিক দিকটা অনেক ক্ষেত্রেই হয় উপেক্ষিত। এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যে স্কুল কলেজের মাধ্যমে যে সঙ্গীত শিক্ষা হচ্ছে, তার সুফল ও কুফল দুই-ই আছে। সুফলের মধ্যে এই যে এতে কলাকার বা উঁচুদরের গাইয়ে সৃষ্টি না হোক, মাঝারী দরের গাইয়ে ও সঙ্গীতের সমঝদার ও বোদ্ধা শ্রোতার সৃষ্টি হচ্ছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসারে এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ সমঝদার ও রসজ্ঞ শ্রোতা না পেলে কলাকারগণ সঙ্গীত পরিবেশন করবে কাদের কাছে ও তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার দামই বা দেবে কে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও অনস্বীকার্য যে শুধু স্কুল কলেজের সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমে কোন প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে বা কলাকার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "...এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে এর সম্পর্কে আমি খুব আশান্বিত নই। কেননা, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যবস্থার কোন দাম নেই। যে প্রেরণা থেকে প্রকৃত গানের জন্ম, ক্লাসরুমের চতুঃসীমার ভিতর কেউ তা পেতে পারে না। স্বরলিপি পরিচয় কিংবা

ধরাবাঁধা কয়েকটা গান শেখাতেই ওই ব্যবস্থার কৃতিত্ব যাবে ফুরিয়ে। দল পাকিয়ে শিক্ষা হয় না, শিক্ষাকে কার্যকরী করতে হলে ছোটখাট শ্রেণীবিভাগের পরে জোর দিতে হবে" (সংগীত চিন্তা ঃ পৃঃ ১২৪-২৫)

পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় সঙ্গীত শিক্ষা ·বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্কুল কলেজের মাধ্যমে হচ্ছে বলে সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা সঙ্গীতের শাস্ত্রজ্ঞানে যতটা ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সঙ্গীতের প্রায়োগিক দিকটায় ততটা নয়। সঙ্গীতে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নেবার পর এরা দরবারী কানাড়ার অতি কোমল গান্ধার, মূলতানী ও টোড়ির কোমল গান্ধারের তফাৎ, জৌনপুরীর ধৈবতের বিশেষ শ্রুতি বা মিঞামল্লার রাগে দুই নিষাদের 'মিঞা অঙ্গ' প্রয়োগ সম্বন্ধে যতটা দক্ষতার সঙ্গে আলেচনা করতে পারেন, এগুলো গানে বা গলায় দেখাতে তাঁদের ততটা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং পরবর্তী কালে এঁদের কাছে যে ছাত্রছাত্রীরা গান শিখে থাকেন, তাঁরা সঙ্গীত শাস্ত্রে যতটা পারদর্শী হয়ে ওঠেন, রাগ-রাগিণী রূপায়ণের প্রায়োগিক দিকটায় ততটা নয়। অথচ দেখুন যে আমাদের দেশের ওস্তাদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ লেখাপড়া জানতেন না ও তাঁদের এতটা শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল না। কিন্তু তাঁরা গান করলেই সঙ্গে সঙ্গে রাগের বিশেষ শ্রুতিগুলো তাঁদের কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠত। সুতরাং এ সম্বন্ধে বলা চলে যে শিক্ষার্থীরা স্কুল বা কলেজ থেকে সঙ্গীতে শুধু ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নিয়েই যদি ক্ষান্ত থাকেন ও উপযুক্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতের প্রায়োগিক দিকটার আর চর্চা না করেন তো কোনদিন তাঁরা বড় গাইয়ে হতে পারবেন না।

তবে সঙ্গীতে নিছক প্রায়োগিক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ ও পরিবেশিত গানকে যেন তেন প্রকারেন আপাতমধুর করে তোলার প্রবণতাতেও অনেক কুফল দেখা দিতে পারে ও এটা কি ভাবে হতে পারে তা নীচে তুলে ধরছি।

যদিও কলকাতার শ্রোতৃমণ্ডলীর রুচিজ্ঞান ও যা ভাল তাকে গ্রহণ করবার ও তারিফ করবার ক্ষমতা সম্বন্ধে কলাকার ও কলারসিক-

দের একটা গভীর আস্থা রয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে স্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলী গানের বেলায় কানে ভাল লাগার ওপর অত্যধিক জোর ও গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এর ফলে কলকাতার আসরে গাইয়ে বাজিয়েদের জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য ও বাহবা পাওয়ার জন্য অনেক সময় তাঁদের পরিবেশিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আপাতমধুর হাল্‌কা জিনিসের আমদানী করার একটা ঝোঁক বা প্রবণতা দেখা যায় যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন গীতরীতির বিশুদ্ধ রূপকে অনেক সময়ই ক্ষতিগ্রস্ত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে এই কলকাতায় অনেক আসরে কিছু তথাকথিত জনপ্রিয় শিল্পীর খেয়াল গানে লঘু চালের গানেব কাজ আমদানী কবে বিলিতি গানের অনুকরণে স্বরক্ষেপন করে সস্তায় বাহবা নেবার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। দেখছি কি করে ঠুংরীও ধীরে ধীরে গজল ও গীতেব পর্যায়ে নেমে আসছে। তাই আজ সময় এসেছে এইরূপ তুবল রসমুগ্ধতা থেকে আত্মবক্ষা কবে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের বিভিন্ন গীতবীতিব বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্যে আন্দোলন করার ও এতে শুধু গাইয়ে বাজিয়েদেবই নয়, শ্রোতৃমণ্ডলীবও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

মনে হয় এই কাজে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা বিশেষ সহায়ক হবে। দেখা গেছে যাদের সঙ্গীত শিক্ষার ভিত্তি ধ্রুপদ সঙ্গীতের ওপর গড়ে উঠেছে তাদের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে স্বভাবতই একটা শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, সংযম ও রাগ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীতে লয়কারী ও স্বরে স্থিতি যা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অত্যাবশ্যক তা ধ্রুপদ চর্চা না করলে ঠিক ভাবে আয়ত্তে আসে না। তাছাড়া আমাদের সঙ্গীতের ভাণ্ডারে এমন সব ধ্রুপদ গান আছে যা গাইলে পরই যে রাগে সেই গান বাঁধা তার রূপ ও চেহারা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়ে যায়।

আগেই বলেছি যে সঙ্গীত বা যে কোন কলাবিদ্যাতেই হোক সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে উঠে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হতে গেলে চাই

সৌন্দর্যবোধ, মেধা ও কল্পনাশক্তি। এবার তার সঙ্গে আর একটি জিনিস যোগ করতে চাই—সেটা হল মননশীলতা। শুধু কণ্ঠ ভাল হলেই বা রেওয়াজ করলেই বা যথেষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেই কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হওয়া যায় না, যদি না এর সঙ্গে থাকে উপরোক্ত গুণগুলি, বিশেষ করে কল্পনাশক্তি ও মননশীলতা। এখানে একটি ছোট উদাহরণ দিই।

শোনা যায় যে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব সকালে বাদল খাঁ সাহেবের কাছে যে গানের তালিম নিতেন, তা অনেক সময়েই সেদিন সন্ধ্যায় রেডিও বা জলসায় তাঁকে পরিবেশন করতে হত। তখন নাকি তিনি ঐ গানটি কয়েকবার শুনে ও তাতে ব্যবহৃত রাগের চলন একটু লক্ষ্য করে তারপর তার আর কোন অনুশীলন বা রেওয়াজ করতেন না। তাতে তাঁর বাড়ির লোকেরা শঙ্কিত হয়ে ভাবতেন যে এই যে তিনি (ভষ্মদেব) গানটি শুধু শুনেই ও ২/১ বার গেয়েই চুপচাপ বসে বা শুয়ে আছেন—সন্ধ্যায় তা লোকের সামনে কি করে সুষ্ঠু ভাবে পরিবেশন করবেন!

কিন্তু তাঁরা অবাক হয়ে দেখতেন যে সন্ধ্যায়ই ঐ গান যখন ভীষ্মদেব পরিবেশন করতেন তখন তা বিস্তার, তান ও বাটে সমৃদ্ধ হয়ে এক অপরূপ সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াত। এর কারণ সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে সকালে যখন তিনি (ভীষ্মদেব) চুপচাপ শুয়ে বা বসে, তখন কিন্তু তাঁর মানসিক রেওয়াজ চলছে ও তাতে তাঁর ভেতর যে একটি অপরূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে, তারই প্রতিফলিত রূপ দেখা দিল সন্ধ্যাবেলাকার আসরে। একেই আমরা বলতে পারি কল্পনাশক্তি বা মননশীলতা।

সাহিত্য, চিত্রকলায় বা সঙ্গীতে কেউ কোনদিন শীর্ষস্থানীয় শিল্পী হতে পারেন না, যদি না তার মধ্যে ঐ বিশেষ গুণটি থাকে। সে জন্যে কোন যুগেই ঝাঁকে ঝাঁকে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর দেখা পাওয়া যায় না ও পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে এই যে প্রথম শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের

শিল্পীর সংখ্যা এত কম তাতে অবাক হবারও কিছুই নেই। কিন্তু তবুও এই যে সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বা শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর শূন্যস্থান পূরণ করার মত কোন বাঙালী খেয়াল গাইয়ের সন্ধান এখনো পাওয়া গেল না (যাঁদের ওপর আমাদের আশা ছিল, তাঁরাও সেটা পূরণ করতে পারেননি) সেটা বাঙালী সঙ্গীত প্রেমিকদের কাছে এক মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা খেয়াল

বাংলা ভাষায় খেয়াল গান রচনা করে গাওয়া যেতে পারে কিনা তা কিছুটা পরিমাণে এখনো বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় যখন আকাশবাণী 'ট্রাডিশন্যাল' নয় বলে বেতারে বাংলা খেয়ালের প্রচারে আপত্তি জানান ও আজ অবধি আকাশবাণীতে বাংলা খেয়াল প্রচারের অনুমোদন মেলেনি, যদিও বেতারে রাগ-প্রধান বাংলা গান বলে যা প্রচারিত হয়ে থাকে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসলে এই বাংলা খেয়ালেরই নামান্তর মাত্র। কিন্তু বাংলা খেয়ালের প্রচার আকাশবাণীতে অনুমোদিত না হলেও ও সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনগুলোতে এর কখনো স্বীকৃতি না মিললেও এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক গুণী ও শিল্পীরাই পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন ও বাংলা খেয়াল প্রচারের স্বপক্ষে ধীরে ধীরে একটা জনমত গড়ে উঠছে, যদিও এর সঠিক মূল্যায়ন বা রূপ সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা এখনো অবধি সম্ভবপর হয়নি।

যাক্, বাংলা খেয়াল 'ট্রাডিশন্যাল' নয় বলে যখন বিশেষ মহল থেকে এক প্রকার আপত্তি এসেছে তখন একটু আলোচনা করে দেখা যাক্ খেয়ালে ট্রাডিশন বলতে কি বোঝায় ও তার বিচারে বাংলা খেয়াল প্রচারে আপত্তি কতটা যুক্তিবহ।

ট্রাডিশন বলতে যদি আমরা খেয়ালের ভাষা সম্পর্কিত কোন কিছুকে বুঝি, তাহলে জিজ্ঞাস্য এই যে খেয়ালের ট্রাডিশন্যাল ভাষাটা কি? সেটা কি খেয়ালের উৎপত্তির সমকালীন ব্রজভাষা? তা হলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে পরবর্তীকালে উর্দু, রাজস্থানী, পাঞ্জাবী ও হিন্দী ভাষায় রচিত অসংখ্য খেয়াল ভাষার বিচারে

'ট্রাডিশন্যাল' নয় ? কিন্তু কার্যতঃ তো দেখা যায় যে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষায় রচিত এই সব খেয়াল সর্বভারতে মান্য ও প্রচলিত। তাই যদি হয় তবে ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গীতিকাব্যে সমৃদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল গানই বা স্বীকৃতি পাবে না কেন ?

'ট্রাডিশন্যাল' বলতে যদি খেয়াল গানের বন্দেজ বা গঠনকে বোঝায়, তাহলে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রচলিত খেয়াল গানকেই কি একমাত্র 'ট্রাডিশন্যাল' খেয়াল বলে গণ্য করতে হবে ? তাহলে পরবর্তীকালে রচিত দরশপিয়া (মেহবুব খাঁ), প্রেমপ্রিয়া (ফৈয়াজ খাঁ), চতুর (ভাতখণ্ডে), সুজান (রতন ঝঙ্কার), বিলায়েৎ হুসেন, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন ইত্যাদি গুণীদের দ্বারা রচিত খেয়াল গান কি 'ট্রাডিশন্যাল' নয় ? কিন্তু এই সব খেয়াল তো আজ সর্বত্র স্বীকৃত ও অনুমোদিত। তাহলে বাংলাদেশের গুণীদের দ্বারা বাংলা খেয়াল রচিত হলে তাকে 'অ-ট্রাডিশন্যাল' বলে এক-ঘরে করে রাখা হবে কেন ?

আবার ট্রাডিশন বলতে যদি আমরা খেয়াল গানের পরিবেশন পদ্ধতিকে বুঝি তাহলে তো প্রশ্ন করা খুবই সঙ্গত যে বর্তমান কালের খেয়াল কি প্রাচীন কালের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করে চলেছে ও তার কি কোন উল্লেযোগ্য পরিবর্তন হয়নি ? তাহলে খেয়াল গানের এতগুলো ঘরাণার সৃষ্টি হল কি ভাবে ? স্বর্গত ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ ঘেঁষা খোলা আওয়াজের গানকেও আমরা খেয়াল বলি, আবার স্বর্গত আব্দুল করীম খাঁ সাহেবের মৃদু মধুর স্বরযুক্ত অনেকটা ভিন্ন পদ্ধতিতে পরিবেশিত গানকেও আমরা খেয়াল বলে থাকি। কিন্তু এই দুই শিল্পীর খেয়াল গানের ঢং ও পরিবেশন পদ্ধতি কি এক ? তাহলে বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা করে খেয়ালের মত এক সৃজনশীল ও গতিশীল গীতরীতির মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আমদানী করলেই তাকে অ-ট্রাডিশন্যাল বলে তার প্রচারে বাধা নিষেধ আরোপ করা হবে কেন ?

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে বাংলা ভাষায় খেয়াল রচিত হলে ট্রাডিশনের দোহাই দিয়ে এর প্রচারে বাধা দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই ও এই সুবাদে আপত্তিটা একটা অন্ধ কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাই বলে বাংলা খেয়াল রচনা ও প্রচারে কি কিছুই বাধা বা অসুবিধে নেই? হ্যাঁ, অসুবিধে কিছু আছে ও সেটা ভাষার দিক দিয়ে না হলেও অন্য দিক দিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে, সেটা নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি কিছুটা বোঝা যাবে।

হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্যই হল তার রাগরূপায়ণ ও মুক্ত সুরবিহার। এই জাতীয় গানে কথা বা বাণীর স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ, এমন কি অর্থহীন 'তোম' 'নোম' ইত্যাদি শব্দ দিয়েও খেয়াল গান রচনা করা যেতে পারে। এই মুক্ত সুরবিহারের প্রাধান্য ও স্বরসংগতির মাধ্যমে রাগরূপায়ণ খেয়াল গানকে অনেক বিমূর্ত ও নির্ভাব করে তোলে। গানের বাণীকে বেশী প্রাধান্য দিলে ও তাকে অবলম্বন বা অনুসরণ করে গানকে বেশী ভাবালু করে তুললে খেয়াল গানের এই অর্থাতীত রূপ ব্যাহত হয়। সুতরাং বাংলা খেয়ালে যদি গানের বাণীকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তবে তাতে রাগরূপায়ণ, সুর-বিহার, ছন্দবিস্তার ইত্যাদি খেয়ালের আবশ্যকীয় ক্রিয়াতে বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে।

ছন্দবিস্তার ও লয় বাঁটোয়ারা হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। অনেক সময় হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের বাণীর অর্থ না বুঝে বিকৃত ও ভুল উচ্চারণে আমরা গান গেয়ে থাকি ও মালকোষ রাগে বিখ্যাত খেয়াল 'পগলাগন দে' গানটিতে শিল্পীর মুখে ছন্দের কাজ করবার সময় 'পাগলা, পাগলা' বলে উচ্চারণ করতে শুনেও আমরা কিছু মনে করি না। কিন্তু বাংলা খেয়ালে অনুরূপ ভাবে শব্দ বিকৃত করলে নিশ্চয়ই তা বাঙালী শ্রোতাদের কানে অত্যন্ত শ্রুতিকটু শোনাবে। নজরুল ইসলাম রচিত ও জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর

দরবারী কানাড়া রাগে গাওয়া 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়' গানটিকে যদি আমরা একটি বাংলা খেয়ালের নমুনা ধরে তাতে ছন্দ বিস্তার করার সময় গানের কথাকে 'আজিনি আজিনি' বা 'ঝুমরা ঝুমরা' বলে ভাঙতে শুরু করি তবে তা কি অত্যন্ত বিসদৃশ লাগবে না? সুতরাং শব্দের অখণ্ডতা, অর্থের পূর্ণতা ও উচ্চারণে স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যদি আমরা বাংলা খেয়াল গান করতে চেষ্টা করি তবে সেটা গায়ন ভঙ্গীর দিক দিয়ে খেয়াল গান হতে পারে কিন্তু তার ভাষাটি আর বাংলা থাকবে না। আবার ভাষা ও উচ্চারণ বাঁচাতে যদি খেয়ালের মুক্ত সুরবিহার ও ছন্দ-বিস্তারকে ব্যাহত করি তবে সে গান খেয়ালের চরিত্র হারিয়ে বড় জোর একটি রাগপ্রধান বাংলা গান হয়ে উঠবে। হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের অনুকরণে বাংলা খেয়াল পরিবেশন করতে গেলে তার সমস্যাটা হবে এইখানেই, ট্রাডিশনের বিচ্যুতিতে নয়।

সুতরাং বাংলা ভাষায় যদি খেয়াল গান বচনা ও প্রচার কবতে হয় তবে এই সব সমস্যা দূব কববাব জন্য তাকে একটা ভিন্নতর ও নবরূপ দেওয়াই বোধহয় শ্রেয় হবে ও তাকে হুবহু হিন্দুস্থানী রীতিতে না গড়ে বাংলা দেশের প্রচলিত ধারা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনমেজাজ অবলম্বন কবে গড়ে তোলাই বোধহয় সঙ্গত হবে। হিন্দুস্থানী টপ্পা গান যখন বাংলা দেশে এসেছিল কখন তাকেও এই ভাবেই বাঙালীর প্রচলিত সঙ্গীতের ধারা ও মন মেজাজকে অবলম্বন করেই শ্রীরামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু তাকে একটি পরিমার্জিত রূপ দিয়েছিলেন, সুতরাং হিন্দুস্থানী খেয়ালের বেলাতেও তার অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করে তাকে এক নবরূপ দেওয়াই বা সম্ভবপর হবে না কেন?

বাংলা খেয়াল গানের স্বকীয়তা ও নবরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি একটি জিনিসের কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই।

হিন্দুস্থানী খেয়াল গানে অনেক সময়েই বিলম্বিত লয়ে গানের সঙ্গে তার জোড়া দ্রুত গানের ভাষা ও অর্থের কোন সামঞ্জস্য

থাকে না, যেমন মিঞামল্লার রাগে ঢিমা লয়ে 'করীম নাম তেরোঁ' গানটি গেয়ে অনেক সময়েই তার জোড়া তুনী গান 'বলোরে পাপৈয়ারা' বা 'উমড ঘুমড ঘেরি বরষে বাদর' গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার খেয়াল গান রচনা করে ঢিমে ও তুনী গানের কথা ও ভাবের অসঙ্গতি দূর করে তাকে ভাবের দিক দিয়ে একটা অখণ্ডরূপ দেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে বাংলা ভাষায় রচিত মিঞামল্লার রাগে রচিত একটি ঢিমা ও তুনী গানের নমুনা রাখছি যা থেকে আমার বক্তব্যটা অনেকটা পরিষ্কার হবে।

বিলম্বিত খেয়াল : স্থায়ী

'ঢেকেছে আকাশ নিবিড় মেঘে দিগন্তে নামে আঁধিয়ার'

অন্তরা

ঘন গরজনে শিহরে নিখিল বনতলে কার অভিসার।

দ্রুত খেয়াল

স্থায়ী

বরষা এলো রে ধেয়ে বিপুল ধারায়
ঘন বরিষণে কালো মেঘের ছায়ায়।

অন্তরা

বিদ্যুৎ ঝলকায় কাশবন দোল খায়
পাগলিনী স্রোতস্বিনী নিরুদ্দেশে ধায়॥

বাংলাদেশে রাগপ্রধান বাংলা গান বলে এক জাতীয় গান প্রচলিত আছে। সেই গানের সঙ্গে বাংলা খেয়াল গানের একটা প্রভেদ রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। তা না হলে উত্তরকালে এই দুই জাতীয় গানের প্রকৃত রূপ ও বৈষম্য সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। এই পার্থক্যটা আমার ক্ষুদ্র বিচার ও বুদ্ধি মতে এই ভাবে প্রধানত রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, রাগপ্রধান বাংলা গান হিন্দুস্থানী গীতরীতির যে কোন

একটিকে, যথা—ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ইত্যাদিকে অবলম্বন করে রচিত হতে পারে। কিন্তু বাংলা খেয়াল রচিত হবে শুধু খেয়ালের বন্দেজে। তাছাড়া রাগপ্রধান বাংলা গানে খেয়ালের কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, যথা কথার সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য মুক্ত সুরবিহার, তান, সরগম, লয়কারী ইত্যাদির আধিক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়, ও এতে কথা ও সুরের সমন্বয়ে একটা ভাবময় রূপ গড়ে ওঠা প্রয়োজন, কিন্তু সেই তুলনায় বাংলা খেয়াল হবে স্বভাবতঃই কিছুটা নির্ভাব বা abstract, ও এতে শুদ্ধ রাগ রূপায়ণের প্রাধান্য থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা খেয়াল গানের ভাষা ও বাণী হবে অপেক্ষাকৃত সরল, সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর। তৃতীয়তঃ, রাগপ্রধান বাংলা গান যে কোন একটি রাগকে প্রধানতঃ ভিত্তি করে রচিত হলেও তাতে যে সেই রাগের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতেই হবে এমন কোন কথা নেই, ও ঠুংরী গানের মত এতে সমপ্রকৃতির রাগের মিশ্রণ হতে পারে। কিন্তু বাংলা খেয়াল গানে রাগের বিশুদ্ধতা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

অবশ্য কেউ যদি চান যে বাংলা খেয়ালকে হুবহু হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের রীতিতে পরিবেশন করে তাকে সর্বভারতীয় রূপ দিতে হবে, তবে তাঁদের উচিত হবে বাংলা ভাষায় খেয়াল গান রচনা করে তাকে বাংলা খেয়াল না বলে শুধু 'খেয়াল' বলা, কারণ অন্যান্য ভারতীয়/প্রাদেশিক ভাষায় যে সব খেয়াল গান রচিত হয়েছে ও যা সর্বভারতীয় মর্যাদা পেয়েছে, কোন সময়েই তাদের সেই ভাষায় চিহ্নিত করা হয়নি, যেমন উর্দু ভাষায় রচিত 'মুবারক বাদিয়া' বা 'অল্লাজানে অল্লাজানে' গানগুলোকে আমরা বলিনে উর্দু খেয়াল বলিনে রাজস্থানী বা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত 'হো নৈন সবাদী' বা 'ঢোলন মণ্ডে জানে' গানগুলোকে রাজস্থানী বা পাঞ্জাবী খেয়াল—এগুলো শুধু খেয়াল বলেই সর্বভারতে প্রচলিত। সুতরাং যাঁরা বাংলা খেয়াল গানকে হিন্দুস্থানী খেয়াল গানের রীতিতে পরিবেশন করে তাকে সর্বভারতীয় মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের উচিত হবে না সেই সব

খেয়াল গানকে 'বাংলা খেয়াল' বলে তাকে প্রাদেশিক গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখা।

তবে আমার মতে হিন্দুস্থানী খেয়াল গানকে হুবহু অনুসরণ করে আরেকটি প্রোটোটাইপ সৃষ্টি না করে বাংলা খেয়ালকে একটি ভিন্নতর পৃথক রূপ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে বিষ্ণুপুরী ঘরানার প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞগণ, যাঁরা এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁরা সাহায্য করতে পারেন, কারণ ঐ ঘরানার গুণীদের দ্বারা এই বিষয়ে কিছুটা কাজ ইতিমধ্যেই হয়েছে বলে অনুমান হয়।

আধুনিক বাংলা গান ও তার গতিপ্রকৃতি

আধুনিক বাংলা গান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথমেই দুটো সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সেই দুটো সমস্যার মধ্যে একটা হল যে আধুনিক বাংলা গানের এই 'আধুনিক' কালটা কবে থেকে ধরা হবে—অন্যটা হল যে আধুনিক বাংলা গান বলতে ঠিক কোন্ ধারার গানকে বোঝাবে।

প্রথমতঃ, আলোচনা করে নেওয়া যাক প্রথম সমস্যা বা তথাকথিত 'আধুনিক' কাল সম্বন্ধে।

বাংলা গানের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। গোড়ার দিক্‌কার সঙ্গীত রচয়িতাদের কথা বাদ দিলেও, এই ধারার গানের এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছেন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই গীত-রচয়িতা পঞ্চক—রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও কাজী নজরুল। এঁদের অভ্যুদয়ের যুগকে বাংলা গানের এক সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে, যখন বাংলা গান উন্নত ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে উঠেছিল।

এঁদের পরবর্তী যুগে বাংলা গানের হাল ধরলেন সর্বশ্রী হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, কমল দাশগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞরা। এঁরা বাংলা গানে আরো কিছু নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য নিয়ে এলেন।

এঁদের যে পরবর্তী যুগ, যার জের এখনো চলছে ও যে যুগের সঠিক মূল্যায়ণ এখনো সম্ভবপর নয়, তাকেই বোধহয় বাংলা গানের ক্ষেত্রে আধুনিক কাল বলা সঙ্গত।

সুতরাং আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে এই সময়কালকে আধুনিক

কাল বলে ধরে আলোচনায় এগোব।

এরপর আলোচনায় আসা যাক—আধুনিক বাংলা গান বলতে কি ধারার গানকে বোঝাবে।

আমরা সাধারণতঃ আধুনিক বাংলা গান বলতে সেই সব গানকেই বুঝে থাকি যার বিষয়বস্তু হল মানব মনের নানা অনুভূতি, বিশেষ করে প্রেম, অনুরাগ ইত্যাদি, ও সেই বিচারে এই ধারার গানকে কাব্যসঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা গানের গঠন বৈশিষ্ট্য যে কী, সে সম্বন্ধে কিছু বলা মুশকিল, কারণ এই ধারার গানের গঠনের কোন একটা সুনির্দিষ্ট ধারা বা রূপ নেই। এর মূলমন্ত্র হল 'একটা নূতন কিছু কর।' তবে আধুনিক গানের মূলমন্ত্র যা ই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত করেই বলা চলে যে এই ধারার গান বাংলা সঙ্গীত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বা অবদান হয়ে দেখা দিতে পারেনি ও সাম্প্রতিক কালে এর আবেদন বাঙালী শ্রোতাদের কাছে দিন দিন কমেই আসছে। এই ধারার গানের দৈন্যের জন্যে অনেক সময়েই আজকাল আমাদের পুরাতনী বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ—গানের দিকেই হাত বাড়াতে হচ্ছে।

আধুনিক বাংলা গানের এই দৈন্যের কারণ কি ও কেন এর আবেদন বাঙালী জনসাধারণের কাছে দিন দিন কমে আসছে তা ভাবতে গিয়ে কতকগুলি কারণের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে ও সেগুলো একে একে বলে যাবার চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ এই ধারার গানে নেই কথা ও সুরের সেই সার্থক সমন্বয় যা আমাদের বাঙালী পূর্বাচার্যদের রচিত গানকে এত আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক করে তুলত।

এই প্রসঙ্গে এটা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য যে বাংলা গানের যে সকল সার্থক রচয়িতা, যথা—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইত্যাদি জন্মেছেন, তাঁরা সবাই ছিলেন একাধারে তাঁদের গানের

গীতিকার ও সুরকার। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীতিকার ও সুরকার হন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। অবশ্য গীতিকার ও সুরকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হলেই যে তাঁদের রচিত গানে কোন আবেদন থাকবে না, এমন কোন কথা নেই। এই প্রসঙ্গে কবি অজয় ভট্টাচার্য রচিত ও সুরসাগর হিমাংশু দত্ত দ্বারা সুরারোপিত গানগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ সমস্ত গান জনসমাজে এককালে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুললে চলবে না যে ঐ সব গানের বেলায় গীতিকার ও সুরকার ভিন্ন ব্যক্তি হলেও ঐ সব গান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রচিত হয়েছিল গীতিকার ও সুবকারেব পরস্পর সহযোগিতায়, যেমন রচিত হযেছিল ববীন্দ্র-নাথের অনেক গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুবী—এঁদের সহযোগিতায়। এর ফলে ঐ সমস্ত গানে কথা ও সুরেব সমন্বয়ের কোন অভাব ঘটেনি। কিন্তু বর্তমান কালে আধুনিক বাংলা গানে গীতিকার ও সুরকার যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হন তাই নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গান রচনার সময়ে দুজনের কোন সহযোগিতা বা সহমর্মিতাও থাকে না, ও অনেক ক্ষেত্রে নাকি গীতিকারকে গান রচনা করতে হয় সুরকারের ফরমাইশ অনুযায়ী। ফলে ঐ সব গান কাব্য ও সুরের সংমিশ্রণে কোনদিন সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে না।

গীতিকার ও সুরকার যদি একই ব্যক্তি হন, তবে কথা ও সুরের সঠিক মিলনে যে কি অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি হতে পারে তার অসংখ্য নমুনা আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতে পেয়ে থাকি ও এখানে তার কয়েকটি নমুনা উপস্থাপনের লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

'বহু যুগের ওপার হতে' গানটিতে 'বহু যুগের' কথাটিতে এমন ভাবে সুর সংযোজন করা হয়েছে

(পা ক্ষ র্সা র্সা না | ধ না া া ক্ষা)
ব ০ ০ হু যু গে ০ ০ ০ র

যে শুধু কথাই নয়, সুরেও যেন আমরা পিছনে ফেলে আসা এক যুগে পৌঁছে যাই।

ইমন কল্যাণে রচিত 'ফুল বলে ধন্য আমি' গানটিতে 'দেবতা ওগো' অংশে কোমল রেখাবের ব্যবহার হয়তো খুব শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু ঐ অংশে আত্মনিবেদনের যে ভাবটি আছে তাকে পরিস্ফুট করে তোলার কাজে ঐ কোমল পর্দাটি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

'আমার আপন গান' গানের, 'তরী আমার করে টলোমলো' অংশে শুধু কথাই নয় সুরও টলোমলো করছে।

(র্ঋা । র্রা র্সা | র্রা র্মর্রা র্রা র্মা)
ট ০ লো ০ ম ০০ লো ০

'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল, বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল' গানে 'ফুলের আগুন' ও 'সৌরভের শিখা' আমাদের মনে যে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করে, সুর তাকে আরও উজ্জ্বলতর করে তোলে। এইরূপ কথা ও সুরের সামঞ্জস্যের বহু দৃষ্টান্ত কবিগুরুর গানে পাওয়া যায় ও সেটা সম্ভবপর হয়েছে তিনি তাঁর গানের গীতিকার ও সুরকার ছিলেন বলেই।

আর একটি প্রবণতা আধুনিক গানে লক্ষ্য করা যায় যা এর রসোপলব্ধিতে বিশেষ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছে ও সেটা হল এতে সাধারণ ও আটপৌরে কথার প্রায়োগ।

শুনতে পাই যে আধুনিক সাহিত্যে বাস্তববাদের দোহাই দিয়ে এর প্রয়োগকে সমর্থন করা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা তা করেন তারা হয়তো এটা ভুলে যান যে গান কানে শোনার জিনিস বলে তাতে ধ্বনি লালিত্যের একটা বিশেষ স্থান আছে ও কোন গীতিকবিতায় তার অভাব থাকলে সেই গান কখনই রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন যে গীতিকবিতায় যে সব সময়েই সংস্কৃত শব্দবহুল জমকালো ধ্বনিব্যঞ্জক শব্দ যথা

'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সমবৃত অম্বর, হে গম্ভীর' বা 'ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপ দহন দীপ্ত বিষয় বিষ বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত' সদৃশ শব্দ প্রয়োগ করতে হবে, তা নয়, অনেক সময় সহজ সরল কথাও তার অন্তর্নিহিত ভাবমাধুর্যে আমাদের মনকে তার দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের পল্লীগীতির কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন 'ও মোর দরদা, আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না' বা ময়মনসিংহ গীতিকায় 'কোথায় পাইব কলসী গো কন্যা কোথায় পাইব দড়ি, তুমি হও গহীন গাং আমি ডুইব্যা মরি'। এই সমস্ত গানের কথা অতি সাধারণ ও অনেক সময়ে গ্রাম্য দোষেও দুষ্ট, কিন্তু তবুও এদের আবেদন আমাদের কাছে এখনো অম্লান। রবীন্দ্রনাথের 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, করেছে দান' বা 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে' গানগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই সমস্ত গানে কোথাও বড় বড় বা সংস্কৃতবহুল শব্দ নেই, কিন্তু সাধারণ কথাই ভাবমাধুর্যে ও উপযুক্ত সুর প্রয়োগে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের ধ্বনিলালিত্য-বিহীন আটপৌরে কথায় এমন কোন মাধুর্য থাকে না, যা আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে। তাছাড়া আধুনিক বাংলা গানের এই কাব্য রিক্ততা আরও অসহনীয় হয়ে ওঠে এই জন্যে যে এতে যে সুর প্রয়োগ করা হয় অধিকাংশ সময়েই তা হয় বৈচিত্র্যহীন ও তাতে এমন কোন মাদকতা বা মুন্সীয়ানা থাকে না যা এই সাধারণ কথাকেও সুরের পাখনায় ভর করে এক অনির্বচনীয়তার ছোঁয়া দিতে পারে।

কথায় আর সুরে মিলে গানের প্রধান আবেদন বা উদ্দেশ্য হল দৈনন্দিন এবং ছোটখাটো বিরোধ ও সাংসারিক আবর্তের মধ্যেও মনকে সংহত, শান্ত ও ঊর্ধ্বমুখী করা। নিছক আনন্দ দান করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। আধুনিক বাংলা গান সঙ্গীতের

এই আদর্শগত চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়ে জনসাধারণের স্থূল রুচির কাছে আত্মসমর্পণে প্রয়াসী বলেই তার এমন শোচনীয় ব্যর্থতা।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আধুনিক গানের রচয়িতারা বাংলা বা ভারতীয় সঙ্গীতের উপকরণ প্রয়োগ বা ব্যবহারে অসমর্থ হয়ে, তাদের গানে বৈচিত্র্য আনার জন্যে বিদেশী সঙ্গীত, যথা জাজ্, পপ্‌সঙ্গীত ইত্যাদির সুর আমদানির দিকে ঝুঁকেছেন। বাংলা গানে অন্যান্য প্রাদেশিক বা বিদেশী সুর প্রয়োগ করলেই যে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেশী সুরের প্রয়োগ দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এঁরাও তাঁদের গানে করে গেছেন ও তা সার্থক ভাবেই করেছেন। সৃষ্টিকর্মে কোন নূতন জিনিসকে আপন করে গ্রহণ করার মধ্যে কোন অপরাধ নেই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও বলে গেছেন ঃ—

"......আমরা কি ইংরেজি শিখি না? কেন শিখি? —ইংরেজি সাহিত্যকে আমাদের সাহিত্যে হুবহু নকল করার জন্যে নয়; তার রসপানে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় স্বকায় শক্তিকেই নূতন উদ্যমে ফলবান করে তোলার জন্যে। ...গানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভালো করে শিখলে তা থেকে আমরা লাভ না করেই পারব না। তবে এ লাভটা হবে তখনই যখন আমরা তাদের দানটা যথার্থ আত্মসাৎ করে তাকে আপন রূপ দিতে পারব। তর্জ্জমা করে বা ধার করে সত্যিকার রসসৃষ্টি হয় না; না সাহিত্যে, না সঙ্গীতে" (সাঙ্গীতিকী—পৃঃ ১৫২)

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে বিদেশী সুরের প্রয়োগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাঁর গানের মধ্যে য়ুরোপীয় আমেজ যদি কিছু এসে থাকে, তবে তাতে দোষের কিছুই থাকতে পারে না, যদি তার মধ্যে দিয়ে একটা নূতন রস আপন মর্যাদায় ফুটে ওঠে।"

('সাঙ্গীতিকী—পৃঃ ১৫৪)

সত্যিই তাই, সত্যিকার বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত যে হিন্দুস্থানী, প্রাদেশিক বা বিদেশী সুর প্রয়োগে গানে নূতন রস আপন মর্যাদায় ফুটে উঠছে কিনা। আধুনিক বাংলা গানে তা হচ্ছে না বলেই অনুরূপ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালের বিদেশী সুব প্রযুক্ত কোন আধুনিক বাংলা গান শুনলে কোন সহজ সরল বঙ্গললনার রুজ লিপস্টিক শোভিত গাউন পরা এক বেমানান চেহারার কথাই মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন ঃ—"বাঙালী ভাগ্যদোষে কুকাব্য লিখতে পারে, কিন্তু অকাব্য লিখতে কিছুতেই তার কলম সরে না" ভাবি কবিগুরু আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকলে ও আধুনিক বাংলা গানের এই কাব্যরিক্ততা দেখলে ও এই ধারার গানের প্রতি বাঙালী শ্রোতাদের অনীহা লক্ষ্য করলে হয়তো বা তিনি তাঁর উপরোক্ত উক্তির সামান্য সংশোধন করে বলতেন ঃ—

"বাঙালী ভাগ্যদোষে কুকাব্য বা অকাব্য লিখতে পারে, কিন্তু রুচিবান বাঙালী সমাজ তা তখনই গ্রহণ করে না।"

কোন সৃষ্টি তখনই হয়ে ওঠে অসার্থক যখন সে এক জায়গায় থেমে অচলায়তনে বাঁধা হয়ে পড়ে। সুতরাং বাংলা গানের এই যে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রগতির প্রচেষ্টা তাতে নিন্দনীয় কিছু নেই, বরঞ্চ তাকে স্বাগত জানানোই কর্তব্য।

বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলই হল শেষ কথা—এরূপ অভিমত নিশ্চয়ই অশ্রদ্ধেয় ও গ্রহণের অযোগ্য। সুতবাং বাংলা গানকে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে নিশ্চয়ই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই যে এগিয়ে নিয়ে যাবার রাস্তা সেটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা নিতান্তই আবশ্যক।

রচনার বিচারে ভারতীয় সঙ্গীতকে মুখ্যত তিনটি ধারায় ভাগ করা চলে। প্রথম ভাগে হল নিছক সুরধর্মী গান। এই ধারার গানে কথা সুরের আজ্ঞাবাহ ভৃত্যমাত্র। দ্বিতীয় ভাগে হল কথা বা বাণী

প্রধান গান, যেমন পাঁচালী কথকতা ইত্যাদি। তৃতীয় ভাগে আমরা এমন সব গান পাই যাতে কথা ও সুর সমান মর্যাদার অধিকারী। সঙ্গীত রচনার এই তৃতীয় ধারাকেই বাংলাদেশ তার সঙ্গীতে চিরকাল অনুসরণ করে এসেছে, সে কখনো তার গানকে অবাধ সুরবিহারের স্বাধীনতা দিয়ে গানের কাব্যাংশকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি। আধুনিক বাংলা গানকেও বাংলাদেশের এই প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করেই এগোতে হবে, কারণ প্রগতি কখনো স্বেচ্ছাচার বা নৈরাজ্য দিয়ে গড়া যায় না। তাকেই বলা চলে প্রগতি, যাতে আছে অগ্রগতির বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কিন্তু তার সঙ্গে রয়েছে ধারাবাহিকতার নিবিড় যোগ। বিরাট স্কাইস্ক্র্যাপার বা অট্টালিক গড়ে তোলা যায় ঠিকই, কিন্তু ভূমির সঙ্গে তার যদি নিবিড় যোগ না থাকে তবে সে একদিন ভেঙ্গে পড়বেই।

তবে এটা খুব সত্যি কথা যে রাগপ্রধান বা ভক্তিমূলক গান রচনার চেয়ে উঁচুমানের কাব্যসঙ্গীত রচনা করা আরো দুরূহ। রবীন্দ্রনাথ এই ধারার গানে সিদ্ধ হয়েছিলেন প্রায় ৫০ বছরের উপর গান রচনায় শিক্ষানবীশী করে তবেই।

আমরাও আশা করব যে আধুনিক বাংলা গানও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে একদিন তার সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে ও আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

এই লেখার উপসংহার করছি কবিগুরুর আশাব্যঞ্জক বাণী দিয়েঃ—"আত্মপ্রকাশের জন্য বাঙালী স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির একান্ত অনুগত হ'তে পারে নি। সেই জন্যেই কানাড়া, আভানা, মালকোষ, দরবারী, তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালীকে কীর্ত্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালোবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরী করতে চেয়েছে, তাই আজ হোক কাল হোক বাংলার গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার

আপন রাস্তাতেই করবে, আর কারও পাথর জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না।"

"একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড় প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না, আর আমাদের এখনকার কালের গ্রামোফোন সঞ্চারী গীতপতঙ্গের দুর্বল গুঞ্জনকেও প্রশ্রয় দেবে না। তার সৃষ্টি অপূর্ব হবে, গম্ভীর হবে, বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে।"

(সংগীতচিন্তা : পৃষ্ঠা ৮১ ও ১৭৬)

বাংলা গানের আকর্ষণ কি বাঙালীদের কাছে কমে আসছে ?

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কালের রচিত বাংলা গানের মান নিম্নমুখী ও এদের আকর্ষণ ও আবেদন বাঙালীর কাছে অনেকটা কমে আসছে (অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান বা নজরুলগীতির জনাপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে)। বাঙালীদের, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে এখনকার রচিত বাংলা গানের প্রতি আস্থা হারিয়ে হিন্দীগীত, যা সাধারণতঃ হিন্দী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রচারিত হয়, তার দিকে ঝুঁকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এখন উৎসব অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে সরস্বতী পুজো, কালীপুজো বা বিশ্বকর্মা পুজোর বারোয়ারী অনুষ্ঠানে মাইকে যে সব রেকর্ডের গান আমাদের কান ঝালাপালা করে, তা কিন্তু বাংলা গান নয়, তা হচ্ছে ঐ সব হিন্দী গান। কলকাতায় আধুনিক গানের জলসায় বোম্বে প্রত্যাগত বাঙালী শিল্পীরা যখন গান করতে বসেন তখন নাকি শ্রোতৃবৃন্দ 'হিন্দী গান চাই' বলে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। শুনতে পাই পশ্চিমবঙ্গে বাংলা গানের তুলনায় হিন্দী গানের রেকর্ড বিক্রীও নাকি অনেক বেশী। এতে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেন হাল আমলের রচিত বাংলা গান আগেকার মত বাঙালী শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারছে না ও কেন তাদের বিরাট এক অংশ হিন্দী গানের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

মনে হয় বর্তমান কালের রচিত ও প্রচারিত বাংলা গান, বিশেষ করে রাগপ্রধান বাংলা গান পল্লী লোকগীতি ও আধুনিক বাংলা গানের রচনা মান ও পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলে ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা পরিমাণে বোঝা যেতে পারে।

রাগভিত্তিক বাংলা গান বহুদিন ধরেই বাংলা দেশে প্রচলিত ও এই ধারার গান রামনিধি গুপ্ত বা. নিধুবাবু থেকে আরম্ভ করে

রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল এঁরা সবাই রচনা করে গেছেন। তবে বর্তমানে আমরা ? রাগপ্রধান বা 'ক্লাসিকো মডার্ণ' বাংলা গান বলতে যা বুঝি তার বোধহয় সূত্রপাত করেন এঁদের পরের যুগে সর্বশ্রী হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, দিলীপকুমার রায়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মন, তারাপদ চক্রবর্তী, সুধীরলাল চক্রবর্তী প্রমুখ সুরকার ও গাইয়েরা। কথা ও সুরের সংমিশ্রণে এগুলি অনবদ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বর্তমান কালে প্রচলিত তথাকথিত রাগপ্রধান বাংলা গান যা আমরা রেকর্ডে ও বেতারে শুনে থাকি ও বেতারে যার অনুমোদন দিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় অডিসন কমিটি নাকি করে থাকেন, তার সঙ্গে ঐ সব পূর্বাচার্যদের রচিত রাগপ্রধান বাংলা গানের একটা মূলগত প্রভেদ রয়েছে ও এই সব গানকে বাংলা খেয়াল গান বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ এই সব গান খেয়ালের আদর্শেই ও বন্দেজে গঠিত। এই সব ধারার রাগপ্রধান বাংলা গানে কথার স্থান হয় গৌণ ও এতে অধিকাংশ সময়েই কবিতার কোন একটি লাইনে কোন রাগের উপর ভিত্তি করে সুর বসিয়ে কোন কথাকে অবলম্বন না করে শুধু 'আ' উচ্চারণ করে গানের বেশীর ভাগ সময়ে মুক্ত সুরবিহার, তান ও সরগমের কাজ করা হয়ে থাকে। সুতরাং আগের কালের রচিত রাগপ্রধান বাংলা গানে কথা ও সুরের সমন্বয়ে যে একটা মিষ্টি ও রোমান্টিক আমেজ ও কাব্যময় রূপ গড়ে উঠেছে, তা বর্তমান কালের নিছক রাগ ও সুরভিত্তিক রাগপ্রধান বাংলা গানগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে এই সব রাগপ্রধান বাংলা গান—গান হয় ঠিকই, রাগপ্রধানও হয়; কিন্তু বাংলা গান হয় না ও এই সব গান ওস্তাদী মহলে বাহবা পেলেও সাধারণ বাঙালী শ্রোতার কাছে এর কোন আবেদন বা আকর্ষণ থাকে না।

বাংলাদেশ পল্লীগীতি ও লোকগীতিতে বিশেষ সমৃদ্ধ; যদিও বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে যাওয়াতে এই ধারার গানের মূল উৎস

স্থানগুলো অধিকাংশই পড়েছে পূর্ববঙ্গে বা অধুনা গঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ-এ। আগেকার যুগে ঐ সব অঞ্চল থেকে লোক পল্লীগীতি সংগ্রহ করে শিল্পী ও সঙ্গীত প্রচারকেরা এখানে ঐ ধারার গান তাদের মূলরূপ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রচার করে গেছেন। ঐ সব গুণী ও শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে আব্বাসউদ্দিন আহ্‌মদ, শচীন দেববর্মন ও হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম। আজকাল অবশ্য এখানে পল্লী ও লোকগীতির প্রচার খুব বেড়েছে সন্দেহ নেই, বিশেষ করে আকাশবাণীর দৌলতে। কিন্তু শুনতে পাই যে এখন প্রাচীন লোক-গীতির নামে নাকি কিছু ভেজাল জিনিসও বাজারে চলছে যা মোটেই অকৃত্রিম ও প্রাচীন লোকগীতি নয়। তাছাড়া আজকাল এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে পল্লী লোকগীতির অনেক গানকে কথা ও সুরের দিক দিয়ে সংস্কার করে ঘষে মেজে তাদের শহুরে করে তোলার চেষ্টা চলছে। হয়তো বর্তমানে আমাদের জীবনযাত্রা ও আকর্ষণ গ্রাম থেকে শহরমুখী হয়ে ওঠার জন্যেই এটা হচ্ছে। কিন্তু এই সব সংস্কারে যে পল্লী ও লোকগীতির বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অনেক পরিমাণে নষ্ট হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। ফলে আমরা আজকাল অনেক সময়েই এই সব লোক বা পল্লীগীতি শুনে পাইনে পল্লী অঞ্চলের মাটির গন্ধ বা তার বাধাহীন উন্মুক্ত প্রান্তরের কোন ছবি, পাইনে ভাটিয়ালী গানে নদীর ভাটির টানে নৌকা বেঁধে দিয়ে অলস বৈঠাটি হাতে নিয়ে বসে থাকা কোন মাঝির ছবি।

আধুনিক বাংলা গান এমন এক ধারার গান, যার কোন ব্যাখ্যা বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা মুশকিল। এই জাতীয় গানের গঠনে কোন বিশেষ গীতিরীতি খুঁজে পাওয়া শক্ত ও এই সব গানের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'একটা নূতন কিছু কর।' একে আকর্ষণীয় ও চটকদার করে তোলার জন্যে এই ধারার গানে সুরে ও কথায় এমন সব জিনিসের আমদানী করা হয়ে থাকে যাকে মোটেই সাঙ্গীতিক বলা চলে না। সুরে বৈচিত্র্য আনার অজুহাতে জাজ্‌, রক অ্যাণ্ড রোল, পপ্‌ মিউজিক

প্রভৃতি বিদেশী সুরের ঢং অনেক সময়ে এই সব গানে প্রয়োগ করা হয় ও বাংলা কথায় বিদেশী সুরের সহাবস্থান যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রীতিপ্রদ হয় না তা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া কাব্য ও সাহিত্যে বাস্তববাদ আনার নজীরে এই সব গানের বাণীতে অনেক ক্ষেত্রেই এমন সব সাধারণ ও আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করা হয় যা সঙ্গীতের ধ্বনির ও শ্রুতির বিচারে অত্যন্ত শ্রুতি-কটু ও বিসদৃশ লাগে। এই কাব্যরিক্ততা আরও অসহ্য হয়ে ওঠে এই জন্যে যে তাতে যে সুর প্রয়োগ করা হয় তাও হয় বৈচিত্র্যহীন ও তাতে এমন কোন মাদকতা থাকে না যা এই সব সাধারণ কথাকে সুরের পাখনায় ভর করে কোন এক উর্ধ্ব ও অসাধারণ স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অনুরূপ আদর্শে গঠিত হিন্দী গীত যা আমরা হিন্দী চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শুনে থাকি তা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এটা কেন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে আমার নিম্নোক্ত কারণগুলোর কথাই বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে।

প্রথমতঃ, হিন্দী গানে যে আবহ সঙ্গীত রচিত হয় তাতে এমন সব দেশী-বিদেশী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় যা বাংলা গানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না বা যার সমাবেশ কলকাতায় হয়তো করা সম্ভবপরও নয়। এই জমকালো আবহ সঙ্গীতই অনেক সময়ে হিন্দী গানের কাব্য ও ও সুরের রিক্ততাকে ঢেকে তাদের আকর্ষণীয় করে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দী গানগুলো সাধারণতঃ গাওয়া হয় খুব চড়া গ্রামে ও প্রাণবন্ত ভঙ্গীতে।

তৃতীয়তঃ, ঐ সব হিন্দী গান আমরা সাধারণতঃ শুনে থাকি ও বিচার করে থাকি নিছক সুর ও ছন্দের দিক দিয়ে ও তার কাব্যাংশের দৈন্যকে অনেক সময়েই আমরা উপেক্ষা করে থাকি, যা আমরা বাংলা গানের বেলায় করিনে। এখানে একটি ছোট উদাহরণ দিলে বিষয়টি

পরিষ্কার হবে। মনে পড়ে বেশ কিছুদিন আগে কোন হিন্দী ফিল্মের একটি গান শুনেছিলাম, তার বাণীটি ছিল এই প্রকার—

'তেরা দিলকা মকান, সইয়াঁ বড়া আলিশান
বোলো কিরায়া কিত্‌না'

—এর বঙ্গানুবাদ অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়—'সখি তোমার হৃদয়ের আবাসস্থলটি খুবই চমৎকার, বল এর ভাড়া কত?' মনে পড়ে সুরের বৈচিত্র্য বা জমকালো আবহ সঙ্গীত, যে কোন কারণেই হোক গানটি এখানে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলা ভাষায় অনুরূপ কোন কথা দিয়ে কোন বাংলা গান রচিত হলে ও তাতে সুরের বা ছন্দের বৈচিত্র্য থাকলেও বাঙালী শ্রোতারা কখনই সেই গানকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতেন না।

চতুর্থতঃ, মারামারি, খুনখারাবি, গোলা-গুলি—যাকে আমরা 'অ্যাকশন' বলে থাকি তাতে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হিন্দী ছবি পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর দর্শকের কাছে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় ও যারা ঐ সব ছবি দেখে থাকেন তারা হয়তো রেকর্ডে ঐ সব ছবির গানগুলোর জন্য ছবিটির উত্তেজক দৃশ্যগুলো আবার মনশ্চক্ষে দেখবার স্বাদ অনুভব করে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা করা যেতে পারে যে বর্তমানে এমন এক যুগ চলেছে যেখানে জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আমরা সবাই স্নায়ুর বৈকল্যে ভুগছি। যেখানে মৃদু মধুর স্নিগ্ধ শীতল কোন কিছুই চিত্তকে স্পর্শ করে না, মনকে নাড়া দিতে হলে চাই উত্তেজক ও ঝাঁঝালো কিছু। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চড়া গ্রামে বাঁধা ও জমকালো আবহ সঙ্গীতের কোলাহলে উদ্দীপ্ত হিন্দী গান সহজেই সেই চাহিদা পূরণ করে হয়তো সাধারণ শ্রোতাকে তার দিকে আকৃষ্ট করে রাখে।

তবে বর্তমানে যে রুচিবিকৃতি দেখা দিয়েছে, স্বচ্ছন্দে বলা চলে তার মূলে রয়েছে বর্তমান সামাজিক ও আর্থিক বিপর্যয়। কর্মব্যস্ত ও জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন, এর মধ্যে সঙ্গীত, সাহিত্য এ সব

শিল্পকলার স্থান কোথায়।

তবে এরূপ রুচিবিকৃতি ও সাংস্কৃতিক নিম্নমান নূতন নয়। এর আগেও এ ঘটেছে, কারণ ললিতকলা কখনও সামাজিক ও আর্থিক অস্থিরতার মধ্যে উন্নতি লাভ করতে পারে না। ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ের পরও শাসক গোষ্ঠীর এ দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতার ফলে এরূপ একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেই জ্ঞানী গুণী শিল্পীরা চিত্ত স্থির করে হাল ধরেছিলেন, যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হয়ে উঠেছিল বাংলার সাহিত্য সঙ্গীতের এক স্বর্ণময় যুগ। পশ্চিমবঙ্গেও অচিরেই অনুরূপ শুভবুদ্ধির উদয় হবে ও এমন সব জ্ঞাণী গুণী শিল্পীদের আবির্ভাব হবে, যাঁরা এই দুঃসহ অবস্থা থেকে বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করে তাকে নূতন পথের সন্ধান দেবেন —এরূপ আশায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।